কার্ল মার্কস ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস

সাম্যবাদী পার্টির ইশতেহার

কার্ল মার্কস *ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস*

ডিসেম্বর ১৮৪৭ থেকে জানুয়ারী ১৮৪৮-এর মধ্যে লিখিত। মূল জার্মান ভাষায় লন্ডনে পাম্ফলেট আকারে প্রথম প্রকাশ ১৮৪৮। মূল জার্মান থেকে ইংরেজী ভাষান্তরঃ স্যামুয়েল মুর, অনুবাদ সম্পাদনা ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস। এই ইংরেজী ভাষান্তর থেকে সিপিএমএলএম বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় অধ্যয়ন গ্রুপ কর্তৃক বাংলায় ভাষান্তর ও প্রকাশ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩। ইংরেজী কপিটি নেওয়া হয়েছে www.marx2mao.com থেকে। এই ইংরেজী পাঠটি ১৮৪৮ এর মূল জার্মান থেকে ১৮৮৮ সালে স্যামুয়েল মুর কর্তৃক অনূদিত ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাদিত, বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয় পিকিঙ ১৯৭০ থেকে নেওয়া হয়েছে; এর প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৬৮, তৃতীয় প্রকাশ ১৯৭০। বর্তমান পাঠে ১৮৮৮ এর ইংরেজী সংস্করণ ও ১৮৯০ এর জার্মান সংস্করণের জন্য এঙ্গেলসের পাদটীকা রয়েছে। এছাড়া লেখকদের ভুমিকা রয়েছে বিভিন্ন সংস্করণের জন্য। শেষে সমাপনী টীকা গণপ্রকাশন, পিকিঙ, সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ এর চীনা সংস্করণ ভিত্তিক। ইংরেজী কপিটি Marxist Internet Archive (www.marxists.org) এর ইংরেজী কপিটির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। সেখান থেকেও কয়েকটি টিকা বাংলায় যুক্ত করা হয়েছে। পাঠের সুবিধার্থে বাংলায় সকল টীকা পাঠের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। বাংলায় ভাষান্তরের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রগতি প্রকাশনের প্রকাশিত বাংলা অনুবাদটির সাহায্য নেয়া হয়েছে এবং তার সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

[টীকাঃ সাম্যবাদী পার্টির ইশতেহার — বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের মহানতম কর্মসূচি-দলিল। 'এই ছোট পুস্তিকা একাই বহু বৃহৎ গ্রন্থের সমতুল্য। সভ্য জগতের সমগ্র সংগঠিত ও সংগ্রামী সর্বহারা আজো তার প্রেরণায় উদ্দীপিত ও অগ্রসর' (লেনিন)। 'কমিউনিস্ট (সাম্যবাদী) লীগের' কর্মসূচি হিসাবে মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখা এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় লন্ডনে, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ২৩ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকাকারে। ১৮৪৮ সালের মার্চ-জুলাই মাসে জার্মান রাজনৈতিক অভিবাসীদের গণতান্ত্রিক মুখপত্র, লন্ডনের জার্মান পত্রিকা (ডয়েচে লন্ডনার জাইতুং)-এ এটি কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। সেই বছরেই জার্মান মূল পাঠটি লন্ডনে ৩০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকাকারে পুনপ্রকাশিত হয়। পরবর্তী প্রামাণ্য সংস্করণাদির ভিত্তি হিসাবে এই সংস্করণের পাঠটিই মার্কস ও এঙ্গেলস ব্যবহার করেন। ১৮৪৮ সালে একাধিক অন্য ইউরোপীয় ভাষাতেও (ফরাসী, পোলীয়, ডেনিশ, ফ্লেমিশ ও সুইডিয়) 'ইশতেহার'-এর অনুবাদ হয়। ১৮৪৮ সালের সংস্করণগুলিতে রচয়িতাদের নাম ছিল না। এ নাম প্রথম ছাপা হয় ১৮৫০ সালে, 'ইশতেহার'-এর প্রথম ইংরেজী অনুবাদ তখন প্রকাশিত হয় চার্টিস্ট পত্রিকা লাল প্রজাতন্ত্রী (রেড রিপাবলিকান)-এ, তার ভূমিকায় পত্রিকার সম্পাদক জর্জ জুলিয়ান হার্নি তাঁদের নামোল্লেখ করেন]

সুচি

পৃষ্ঠা

বাংলা ভাষান্তরের ভূমিকা---------- ৪

১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের ভুমিকা---------- ৯

১৮৮২ সালের রুশ সংস্করণের ভুমিকা---------- ১১

১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণের ভুমিকা---------- ১৩

১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণের ভুমিকা---------- ১৪

১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের ভুমিকা---------- ২০

১৮৯২ সালের পোলিশ সংস্করণের ভুমিকা---------- ২৭

১৮৯৩ সালের ইতালীয় সংস্করণের ভুমিকা---------- ২৯

সাম্যবাদী পার্টির ইশতেহার----------

১ম অধ্যায়ঃ বুর্শোয়া ও সর্বহারা----------

২য় অধ্যায়ঃ সর্বহারা ও সাম্যবাদীরা---------- ৪৬

৩য় অধ্যায়ঃ সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী সাহিত্য---------- ৫৬

১। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র---------- ৫৬

ক) সামন্ত সমাজতন্ত্র---------- ৫৬

খ) ক্ষুদে বুর্শোয়া সমাজতন্ত্র---------- ৫৯

গ) জার্মান অথবা "খাঁটি" সমাজতন্ত্র---------- ৬১

২। রক্ষণশীল অথবা বুর্শোয়া সমাজতন্ত্র---------- ৬৪

৩। সমালোচনামূলক কল্পনাশ্রয়ী (ইউটোপীয়) সমাজতন্ত্র আর সাম্যবাদ---- ৬৬

৪র্থ অধ্যায়ঃ বিদ্যমান বিভিন্ন বিরোধী পার্টিগুলির সাথে সাম্যবাদীদের সম্পর্ক- ৬৯

সাম্যবাদী ইশতেহারের বাংলা ভাষান্তরের ভূমিকা

সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে বাংলায় বেশ কয়টি অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও ইশতেহারের আরো একটি অনুবাদ কেন করা হল। লেনিন যথার্থই বলেছেন, *"এই ছোট গ্রন্থটি একাই বহু বৃহৎ গ্রন্থের সমতুল্য..."*। তাই এর ভাষান্তর হতে হবে সঠিক ও সহজ সরল বোধগোম্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রগতি প্রকাশনার বাংলা অনুবাদটি সবচেয়ে পঠিত। আর এটি অবশ্যই সঠিক, কিন্তু এর ভাষা অনেকটা কঠিন। আবার সব অনুবাদেই অধিকাংশ টীকা বাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এমন একটি অনুবাদ দরকার যার প্রতিটি লাইন পড়ে পাঠক বুঝতে পারবেন। তাই আমরা প্রতিটি লাইন সঠিকভাবে অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি, আর বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। আমরা আশা করি পাঠকবৃন্দ এর ভুল ভ্রান্তি ধরিয়ে দেবেন। আমরা তৎক্ষণাৎ তা সংশোধন করার চেষ্টা করব।

এই বইটির গুরুত্ব কী? লেনিনের বক্তব্য থেকেই আমরা জানি সভ্য দুনিয়ার সর্বত্র আজো এই বইটাই হচ্ছে সকল শ্রেণী সচেতন সর্বহারার ভিত্তি। সাম্যবাদীদের আন্তর্জাতিক সংগঠণ সাম্যবাদী লীগ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে ১৮৪৮ সালে এই বইতে মার্কস ও এঙ্গেলস আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণীর দর্শন বস্তুবাদ মূর্ত করেছেন। আমাদের ইচ্ছা নিরপক্ষেভাবে যা কিছু অস্তিত্বমান তাই বস্তু। তার মধ্যে রয়েছে প্রকৃতি, সমাজ ও মানব চেতনা। আর এসব দ্বন্দ্ববাদের নিয়মে বিকশিত হয়। অর্থাৎ দুই বিপরীত দিকের মধ্যে দ্বন্দ্বের মাধ্যমে এই বিকাশ হয়, তাই এই দর্শন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। আবার মানব সমাজের ক্ষেত্রে এই দর্শন প্রয়োগ করে এর জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি জানা যায়, তখন একে বলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এভাবেই ইশতেহার দেখিয়েছে কীভাবে আদিম সাম্যবাদী সমাজের বিলোপের পর শ্রেণীসমাজঃ একে একে দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ ও বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ জন্ম নিয়েছে, আর এই পুঁজিবাদী সমাজই সর্বশেষ শ্রেণী সমাজ। এই সমাজের মধ্যে রয়েছে দ্বন্দ্ব। তাই তা ভেঙে পড়বে, জন্ম নেবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ যা অবশেষে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজের জন্ম দেবে।

সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোই হচ্ছে ভিত্তি কাঠামো যা থেকে চেতনার কাঠামো গড়ে উঠে। আদিম সাম্যবাদী সমাজের বিলোপের পর থেকে মানব সমাজের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাসঃ শোষক ও শোষিতের মধ্যে, আধিপত্যকারী শ্রেণী ও নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম। এই শ্রেণীসংগ্রাম আজ এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণী সর্বহারাকে নিজেকে মুক্ত করতে সমগ্র মানব জাতিকেও মুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ সকল শোষণ ও নিপীড়ণকে চিরতরে অবসান ঘটাতে হবে। এই হচ্ছে ইশতেহারের মূল কথা। সেজন্য ইশতেহার সর্বহারা শ্রেণীকে তার ঐতিহাসিক কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। দেশে দেশে কীভাবে সাম্যবাদী পার্টি গড়ে তুলতে হবে তার দিক নির্দেশনা দেয়। প্রতিটি দেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন ও নেতৃত্ব দেয়ার কথা বলে। সর্বত্র ও সর্বদাই মালিকানার প্রশ্নকে সংগ্রামের প্রধান প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরতে বলে।

ইশতেহার দেখিয়েছে কীভাবে ইতিহাসে শ্রেণীসমূহ জন্ম নিয়েছে, যথা বুর্শোয়ারা কীভাবে মধ্যযুগে একটি মধ্যশ্রেণী থেকে আধুনিক যুগে আধিপত্যকারী শ্রেণী হিসবে জন্ম নিয়েছে। সে কীভাবে শ্রমিকদের মূল্য শোষণ করে পুঁজি বাড়িয়ে তোলে। শিল্প যত বড় হতে থাকে শ্রমিক শ্রেণীও বড় ও ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এই ঐক্য পুঁজির বৃদ্ধির জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, কারণ শ্রমিকদের প্রতিযোগিতার ফলে পুঁজি অধিক মূল্য শোষণ করতে পারত। এদিকে পুঁজিপতি গ্রুপগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতায় মুনাফার হার কমতে থাকে। অতি উৎপাদনের সংকট দেখা দেয়। বুর্শোয়ারা উৎপন্ন সামগ্রী ধ্বংস করে ফেলে। দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তারা যার (সর্বহারার) মাধ্যমে খায় তাকেই এখন খাওয়াতে হবে। কিন্তু তা করতে তারা ব্যর্থ। ফলে সে আর তার ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্বমান থাকা অসম্ভব ও অবাস্তব। কিন্তু পুঁজিপতিরা নতুন নতুন বাজার দখল করে আর পুরোনো বাজারের উপর শোষণ বাড়িয়ে টিকে থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু আবারো প্রতিযোগিতার ফলে আরো বেশি সংকটে পড়ে। সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত এই চক্রের মধ্যেই এটা ঘুরপাক খেতে থাকবে।

উনিশ শতকে মার্কস এঙ্গেলসের সময় ইতিহাসে সর্বহারা শ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মার্কস ও এঙ্গেলস এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে সচেষ্ট ছিলেন সাম্যবাদী লীগ, পরে শ্রমজীবি মানুষের আন্তর্জাতিক সংঘ মারফত। মার্কস ও এঙ্গেলসের নেতৃত্বেই এই সর্বহারার আন্তর্জাতিক সংগঠন সাম্যবাদী লীগ এবং তারপর শ্রমজীবি মানুষের আন্তর্জাতিক সংঘ গড়ে

উঠে যা প্রথম আন্তর্জাতিক নামে পরিচিত। প্রথম আন্তর্জাতিক ১৮৭৪ সালে ভেঙে যাওয়ার পর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক এঙ্গেলসের নেতৃত্বে গঠিত হয় ১৮৮৯ সালে। পরবর্তীতে বিশ শতকে লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিক (কমিন্টার্ন) গঠিত হয় ১৯১৯ সালে যা পরে স্তালিনের নেতৃত্বে ছিল। ১৯৪৩ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দেওয়ার পর আর কোন আন্তর্জাতিক গঠিত হয়নি। মাওসেতুঙ আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনকে নেতৃত্ব করেছেন। ১৯৮৪ সালে সাম্যবাদীদের আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন (রিম) গঠিত হয় যা বিশ শতকের শেষে বিলুপ্ত হয়। সাম্যবাদী লীগের সময় থেকেই ইউরোপের দেশে দেশে তা বিপ্লবী লড়াইয়ে কার্যকর নেতৃত্বকারী ভূমিকা রাখে। শোষক শ্রেণীও পাল্টা আঘাত হানে। মার্কস এঙ্গেলস ও সাম্যবাদীদের ইউরোপের অনেক দেশ থেকে বিতাড়িত করে, সাম্যবাদীদের অনেকেকে বন্দী করে। এভাবে ১৮৭১ সালে প্যারিসে সর্বহারার শাসন কায়েম হয়। মাত্র দুই মাস শ্রমিকেরা ইতিহাসখ্যাত প্যারি কমিউন নামে পরিচিত এই শাসন বজায় রাখতে পেরেছিল। মার্কস এঙ্গেলস আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে বলেন যে সর্বহারা শ্রেণী তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রের শুধু দখল বজায় রেখেই নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে পারেনা। এই পুরোনো রাষ্ট্রকে ভাঙতে হবে, চূর্ণ করতে হবে। সেখানে বসাতে হবে নিজ রাষ্ট্র। এ থেকেই সর্বহারা একনায়কত্বের ধারণা আসে। এই তত্ত্ব পরবর্তীতে রাশিয়া, চীনসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রযুক্ত হয়েছে। মার্কস এঙ্গেলস বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল এবং সর্বহারা একনায়ত্বের মাধ্যমে শোষকদের উপর শাসন পরিচালনা করার কথা বলেছেন। সর্বহারা বিপ্লবের প্রধান লড়াই তখন ইউরোপে কেন্দ্রীভূত ছিল। তাই মার্কস এঙ্গেলস ধারণা করেছিলেন ইউরোপের একসারি দেশে প্রথম বিপ্লব ঘটবে। প্যারি কমিউনের মত একই রকম ঘটনা পুরো ইউরোপেই ঘটতে চলেছিল। আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে ৮ ঘন্টা কর্মদিবসের লড়াই জয়যুক্ত হয় এবং নারীমুক্তির লড়াই অগ্রসর হয়। উনিশ শতকের শেষের দিকে একচেটিয়া পুঁজিবাদ অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব ঘটে, ফলে বিপ্লবের ভারকেন্দ্র সাম্রাজ্যবাদের দুর্বল গ্রন্থি রাশিয়ার মত দেশে চলে যায়। রুশদেশে বিপ্লব ঘটে। পরে বিপ্লবের ভারকেন্দ্র চীনের মত উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদের অধীন দেশে চলে আসে। তাই, সভাপতি মাও সেতুঙ বলেছেন, এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি হচ্ছে বিশ্ববিপ্লবের ঝটিকাকেন্দ্র।

ইশতেহার ধারণা দিয়েছে প্রতিটি দেশে সর্বহারাশ্রেণীকে বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করে কর্মসূচি নিতে হবে। বিপ্লবের মাধ্যমে ধাপে ধাপে এগুতে হবে। পরবর্তীতে সাম্যবাদী পার্টি গড়ার লাইন লেনিনের নেতৃত্বে গড়ে উঠে। রাশিয়ায় লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে আর চীনে মাও সেতুঙের নেতৃত্বে ধাপে ধাপে বিপ্লব গড়ে উঠে ও জয়যুক্ত হয়েছেঃ সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে প্রথমে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও অব্যবহিত পরেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সর্বহারা শ্রেণী একধাপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গড়তে পারে। কিন্তু যেখানে সমাজ পশ্চাদপদ সেখানে প্রথমে সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদ তারপর পুঁজিবাদকে উৎখাত করতে হয়। আগেই বলা হয়েছে, ইশতেহারের সময়ে পুঁজিবাদ তখনো সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে যায়নি। লেনিন দেখান পুঁজিবাদী বড় কোম্পানীগুলি একচেটিয়া হতে হতে পুঁজিবাদকে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তর করেছে। এই সাম্রাজ্যবাদই পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ও শেষ পর্যায়। এই সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে আমরা পুঁজিবাদের আরো আগ্রাসী রূপ ফ্যাসিবাদের উদ্ভব দেখেছি। এই রূপ আমরা এখন প্রায় প্রতিটি দেশেই দেখতে পাই। এটি একচেটিয়া পুঁজিবাদের একটি রূপ যা বাজার দখলের জন্য মরিয়া হয়ে জাতীয়তাবাদ অথবা ধর্মবাদকে কাজে লাগায়, সমরবাদী হয়ে উঠে, গণহত্যা চালায়। এরা চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বৈরতান্ত্রিক। এর বিরুদ্ধে স্তালিনের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদবিরোধী ফ্রন্ট গড়ে উঠে। চীনে মাও সেতুঙ দেখান যে সর্বহারা শ্রেণীকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে হবে, তাই এই বিপ্লব নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এখানে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে জনগণের যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় যাতে শোষিত শ্রেণী অংশ নেয় যথাঃ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যশ্রেণী ও জাতীয় বুর্শোয়া (বুর্শোয়াদের দেশপ্রেমিক অংশ যারা স্বাধীন বিকাশ চায়)। সর্বহারার নেতৃত্বে এই বিপ্লব অব্যাহতভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে ধাবিত হয়।

রাশিয়ায় কয়েক যুগের সংগ্রামের পর প্রথমে সশস্ত্র অভ্যুথান তারপর সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রেণীশত্রুকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। চীনে ২৪ বছর দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ পরিচালনার মাধমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা হয়। এভাবে গণযুদ্ধের তত্ত্ব গড়ে উঠে। যা সাম্যবাদীরা এখন সংগ্রামের গোড়া থেকেই প্রয়োগ করেন। গণযুদ্ধ হচ্ছে জনগণের যুদ্ধ, জনগণকে সমাবেশিত করেই এ যুদ্ধ চালানো যায়। যুদ্ধ ছাড়া শোষকদের পরাজিত করা অসম্ভব।

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জারকে হটিয়ে সংঘটিত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নয় মাসের মধ্যেই নভেম্বরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। চীনে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধমে উপনিবেশবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করার পর এক দশকের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়। তারপর সমাজতান্ত্রিক সমাজে জন্ম নেয়া বুর্শোয়া চিন্তা চেতনার বিরুদ্ধে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এক দশকব্যাপী সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা করা হয়। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বঃ সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে যেতে এই বিপ্লব একবার নয় বহুবার ঘটাতে হবে। সাম্যবাদীরা এখন প্রথম থেকেই এর নীতিমালা প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রে শোষক শ্রেণী আবির্ভূত হয়ে ভিত্তিকে উৎপাটিত করতে পারে। তাই চিন্তার ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রকাশের বিরুদ্ধে মতাদর্শিক সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

মহান মার্কস এঙ্গেলস 'দুনিয়ার মজদুর এক হও!' ঘোষণা করার সাথে সাথেই সারা দুনিয়ায় এক মহান আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সারা দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে সাম্যবাদী পার্টি গঠিত হয় বা এখনো হচ্ছে। এই লড়াইয়ে কোটি কোটি মানুষ জীবন দান করেছেন। রাশিয়া, চীন সহ ১৫টি দেশে সমাজতন্ত্রের লড়াই জয়যুক্ত হয়েছিল। পেরু, নেপাল, ফিলিপাইন, ভারত, তুরস্ক ও বাংলাদেশে গণযুদ্ধ গড়ে উঠেছিল। এখনো অনেক দেশে তা চলমান। অনেক দেশে তা পুনরায় গড়ে ওঠার প্রস্তুতি চলছে। পৃথিবীর সব দেশেই এই প্রক্রিয়া চলমান। আর চলতেই থাকবে। আজকে ২১ শতকে সাম্যবাদী ইশতেহার সারা দুনিয়ার সর্বহারাশ্রেণী ও সাম্যবাদীদের জন্য বিগত দুই শতকের মতই অনেক প্রয়োজনীয়। শ্রেণী সচেতন সর্বহারাশ্রেণী ও সাম্যবাদী গড়ে তুলতে প্রথম বইই হচ্ছে সাম্যবাদী ইশতেহার। তাই আমরা আশা করি আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হবে।

কেন্দ্রীয় অধ্যয়ন গ্রুপ

বাংলাদেশের সাম্যবাদী পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী)

১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৩

১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের ভুমিকা

[টীকাঃ গণরাষ্ট্র (দিয়া ফক্সস্ট্যাট) পত্রিকার সম্পাদনা বোর্ডের উদোগে একটি নতুন জার্মান সংস্করণ ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয় মার্কস ও এঙ্গেলসের ভূমিকাসমেত। এই সংস্করণে কিছু গৌণ ভুল-ত্রুটির সংশোধন করা হয়। এর শিরোনাম ছিল সাম্যবাদী ইশতেহার। পরবর্তী কালের ১৮৮৩ ও ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণগুলিরও একই শিরোনাম ছিল]

সাম্যবাদী লীগ ছিল শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক এক সংস্থা। তখনকার পরিস্থিতি অনুসারে তার গোপন সংগঠন হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে লন্ডনে এর অনুষ্ঠিত কংগ্রেস নিম্নস্বাক্ষরকারীদের দায়িত্ব দেয় পার্টির বিশদ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কর্মসূচি রচনা করতে প্রকাশের জন্য। নিচের ইশতেহারের উদ্ভব ছিল এমনই। এর পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের জন্য লন্ডনে যায় ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের *[টিকাঃ ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব, ১৮৪৮]* কয়েক সপ্তাহ পূর্বে। প্রথম প্রকাশ হয় জার্মান ভাষায়, তারপর একই ভাষায় পুনমুদ্রিত হয়ে কমপক্ষে বারটি বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হয় জার্মানী, ইংল্যান্ড আর আমেরিকায়। এর ইংরেজী ভাষায় প্রথম প্রকাশ ১৮৫০ সালে লন্ডনে রেড রিপাবলিকান (লাল প্রজাতন্ত্রী) *[টিকাঃ লাল প্রজাতন্ত্রী (দি রেড রিপাবলিকান) ছিল জর্জ হার্নিয়ে কর্তৃক ১৮৫০ সালের জুন থেকে নভেম্বরে প্রকাশিত চার্টিস্ট সাপ্তাহিক পত্রিকা। এর নভেম্বর ২১-২৪ ১৮৫০ সংখ্যায় সাম্যবাদী পার্টির ইশতেহারের প্রথম ইংরেজী অনুবাদ আবির্ভূত হয় জার্মান সাম্যবাদী পার্টির ইশতেহার শিরোনামে]*-এ, অনুবাদ করেন মিস হেলেন ম্যাকফার্লেন, তারপর ১৮৭১ সালে আমেরিকায় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। প্রথম ফরাসী সংস্করণ আবির্ভুত হয় প্যারিসে ১৮৪৮-এর জুন অভ্যুত্থানের সামান্য আগে আর সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে সমাজতন্ত্রী (লা সোশ্যালিস্তে) *[টিকাঃ সমাজতন্ত্রী (লা সোশালিস্তে) ছিল আন্তর্জাতিকের ফরাসী অংশের মুখপত্র যা ফরাসী ভাষায় সাপ্তাহিক হিসেবে অক্টোবর ১৮৭১ থেকে মে ১৮৭৩ পর্যন্ত নিউইয়র্কে প্রকাশিত হয়। আন্তর্জাতিকের উত্তর আমেরিকান ফেডারেশনের বুর্শোয়া ও ক্ষুদে বুর্শোয়া উপাদানগুলিকে এই পত্রিকা সমর্থন করে। ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হেগ কংগ্রেসের পর তা আন্তর্জাতিকের সাথে যোগাযোগে সহযোগিতা করে। ১৮৭২ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে এই পত্রিকায় সাম্যবাদী পার্টির ইশতেহার প্রকাশিত হয়]* পত্রিকায়। আরো একটি নতুন একটি অনুবাদের কাজ চলছে। প্রথম জার্মান প্রকাশের অল্প কিছুকাল পরেই পোলিশ সংস্করণ আবির্ভুত হয়। ঊনিশ শতকের ষাটের দশকে জেনেভায়

প্রথম রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশের অল্প কিছু দিনের মধ্যে ড্যানিশ ভাষায়ও এর অনুবাদ হয়।

যাহোক, বিগত পঁচিশ বছরে বাস্তব অবস্থার অনেক ওলট পালট ঘটেছে, কিন্তু ইশতেহারে স্থাপিত সাধারণ নীতিমালা সামগ্রিকভাবে আজকেও আগের মতই সঠিক। এখানে সেখানে কিছু বিস্তারিত ব্যাখার উন্নতি করা যেত। ইশতেহার যেমনটা বলেছে, সর্বত্র ও সর্বদাই নীতিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করছে সে সময়ের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর, আর তাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে যেসব বিপ্লবী ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হয়েছে তার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়নি। আজকে ঐ অনুচ্ছেদটি অনেক দিক থেকেই খুবই ভিন্নভাবে লিখতে হত। বিগত পঁচিশ বছরে আধুনিক শিল্পের অতিকায় অগ্রগতি, সেইসাথে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি সংগঠনগুলির উন্নতি ও প্রসার, আর প্রথমে ফ্রেব্রুয়ারী বিপ্লব তারপর তার চেয়ে আরো বেশি যা সেই প্যারী কমিউন যেখানে সর্বহারা শ্রেণী সর্বপ্রথমবারের মত পুরো দুই মাসের জন্য ক্ষমতা দখল করে রাখে, ইত্যাদি প্রেক্ষিতে যে বাস্তব অভিজ্ঞতাসমূহ অর্জিত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় ইশতেহারের কর্মসূচি কিছু বিস্তারিতর দিক থেকে সেকেলে হয়ে গেছে। কমিউন বিশেষভাবে এই জিনিসটা প্রমাণ করেছে যে "শ্রমিক শ্রেণী তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে স্রেফ দখলে ধরে রেখেই নিজের কাজে লাগাতে পারেনা।" (দেখুন ফান্সে গৃহযুদ্ধ; আর এই পয়েন্টটাকে আরো বিকশিত করা হয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা, লন্ডন, ট্রুলাভ, ১৮৭১, পৃঃ ১৫-এ)। এটা আরো স্বতস্পষ্ট যে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের সমালোচনা আজকের দিনের তুলনায় কম আছে, কারণ সেটা ছিল কেবল ১৮৪৭ পর্যন্ত; একইভাবে বিভিন্ন বিরোধী পার্টির সাথে সাম্যবাদীদের সম্পর্কের উপর মন্তব্যগুলি (চতুর্থ অধ্যায়) যদিও নীতিগতভাবে এখনো সঠিক, তবু ব্যবহারিকভাবে সেকেলে হয়ে গেছে, কেননা রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমগ্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, আর ইতিহাসের অগ্রগতি সেখানে উল্লেখিত অধিকাংশ রাজনৈতিক পার্টিকেই এই দুনিয়া থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে।

কিন্তু ইশতেহার এখন একটা ঐতিহাসিক দলিল হয়ে গেছে যার পরিবর্তন করার কোন অধিকার আর আমাদের নেই। ১৮৪৭ থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে ব্যবধান তা পুরণ করার জন্য সুচনাসমেত একটা নতুন সংস্করণ হয়তো আবির্ভূত হবে; এই পুনমুদ্রণ এত অপ্রত্যাশিতভাবে বেরল যে তার জন্য আমরা কোন সময় পাইনি।

কার্ল মার্কস ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, লন্ডন, ২৪ জুন ১৮৭২

১৮৮২ সালের রুশ সংস্করণের ভুমিকা

[টিকাঃ এখানে ১৮৮২ সালে জেনেভায় প্রকাশিত ইশতেহারের দ্বিতীয় রুশ সংস্করণের কথা বলা হচ্ছে। অনুবাদক হিসেবে গ ভ প্লেখানভের নাম বলেছেন এঙ্গেলস তার "রাশিয়ায় সামাজিক সম্পর্কসমূহ" নিবন্ধের সংযুক্তিতে। ১৯০০ সালের রুশ সংস্করণে প্লেখানভও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনিই অনুবাদটি করেছেন। ১৮৮২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারীতে নারোদনা ভলিয়া (জনগণের ইচ্ছাশক্তি) কর্তৃক প্রকাশিত রুশ সংস্করণের ভূমিকা লেখেন মার্কস ও এঙ্গেলস। ১৮৮২ সালের ১৩ এপ্রিল জার্মান ভাষায় এই ভূমিকা প্রকাশিত হয় জার্মান সমাজ গণতন্ত্রী পার্টির মুখপত্র সমাজ গণতন্ত্রী পত্রিকার ১৬নং সংখ্যায়। এঙ্গেলস ইশতেহারের ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এই ভূমিকাকে যুক্ত করেন।]

সাম্যবাদী পার্টির ইশতেহার এর প্রথম রুশ সংস্করণ অনুবাদ করেন বাকুনিন, আর কলোকল মুদ্রন কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে ষাটের দশকের শুরুতে *[টিকাঃ এই সংস্করণ ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। এঙ্গেলসের ১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় ইশতেহারের রুশ অনুবাদের প্রকাশনা তারিখ ভুলভাবে দেওয়া হয়েছিল]* তা প্রকাশিত হয় *[টিকাঃ কলোকল (ঘণ্টা)—ভিভস ভোকো! (জীবিতদের ডাক দিই!) এই আদর্শবাণী নিয়ে রুশ ভাষায় প্রকাশিত একটি রাজনৈতিক প্রত্রিকা। প্রকাশক ছিলেন আ ই গের্তসেন ও ন প ওগারিয়ভ। গের্তসেন প্রতিষ্ঠিত লন্ডনে মুক্ত রুশ প্রেস থেকে এটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এবং জেনেভায় ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৮৬৮ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত পত্রিকাটি রুশ ক্রোড়পত্র সহ ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়]* তখন পশ্চিমারা একে (ইশতেহারের রুশ সংস্করণ) মনে করে থাকতে পারে স্রেফ সাহিত্যিক ঔৎসুক্যের প্রকাশ মাত্র। এরকম একটি দৃষ্টিভঙ্গি আজকে অসম্ভব। সেসময় সর্বহারা আন্দোলন কতটাই না সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র দখল করে ছিল (ডিসেম্বর ১৮৪৭) তা সর্বাধিক পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে ইশতেহারের শেষ অংশঃ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিরোধী পার্টির সঙ্গে সাম্যবাদীদের সম্পর্ক। রাশিয়া আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই সেখানে নেই। এটা ছিল এমন একটা সময় যখন রাশিয়া ছিল সকল ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার সর্বশেষ বৃহৎ আশ্রয়, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসনের মাধ্যমে ইউরোপ থেকে উদ্বৃত্ত সর্বহারা শক্তিসমূহ শুষে নিচ্ছিল। উভয় দেশই ইউরোপকে কাঁচামাল যোগান দিত আর সেইসাথে ছিল তার শিল্পজাত সামগ্রীর বাজার। সেসময় উভয় দেশই ছিল কোন না কোন ভাবে বিদ্যমান ইউরোপীয় প্রচলিত ব্যবস্থার খুঁটি।

আজকে অবস্থা কতই না বদলে গেছে! ঠিক এই ইউরোপীয় অভিবাসনই উত্তর আমেরিকায় এক অতিকায় কৃষি উৎপাদন সম্ভব করে তুলেছে, যার প্রতিযোগিতা ইউরোপীয় ক্ষুদ্র ও

বৃহৎ নির্বিশেষে ভুমি সম্পত্তির খোদ ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তার সাথে এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সক্ষম করে তুলেছে তার বিপুল শিল্প সম্পদকে এমন এক শক্তি ও মাত্রায় কাজে লাগাতে যা অচিরেই শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের বিশেষত ইংল্যান্ডের এযাবত কালের বিদ্যমান একচেটিয়াকে ভেঙে ফেলতে বাধ্য। উভয় পরিস্থিতি খোদ আমেরিকার উপরেই বিপ্লবী উপায়ে প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। কৃষকদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ভুমি মালিকানা, যা হচ্ছে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি, ধাপে ধাপে তা অতিকায় খামারগুলোর প্রতিযোগিতার কাছে হার মানছে; একইসাথে শিল্পাঞ্চলগুলোতে ব্যাপক সর্বহারা শ্রেণীর সমাবেশ আর বিপুল পুঁজির কেন্দ্রীভবন ঘটছে প্রথমবারের মত।

তারপর রুশদেশ! ১৮৪৮-৪৯ এর বিপ্লবের সময় ইউরোপীয় রাজন্যবর্গই শুধু নয়, ইউরোপীয় বুর্শোয়ারাও সদ্যজাগরণরত সর্বহারা শ্রেণীর হাত থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র পথ খুঁজে পেয়েছিল রুশ হস্তক্ষেপের মধ্যে। জারকে ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার সর্দার ঘোষণা করা হয়েছিল। আজ সে গ্যাচিনায় *[টিকাঃ এখানে ১৮৮১ সালের ১৩ মার্চ নারোদনা ভলিয়ার সদস্যদের দ্বারা জার দ্বিতীয় আলেক্সান্ডারের হত্যার পরবর্তী পরিস্থিতির কথা বলা হচ্ছে। তৃতীয় আলেক্সান্ডার নারোদনায় ভলিয়ার গোপন কার্যকরী কমিটির সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের ভয়ে গ্যাচিনায় লুকিয়েছিল। গ্যাচিনা বর্তমান লেনিনগ্রাদের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত একটি এলাকা]* বিপ্লবের কাছে যুদ্ধবন্দীর মতন। আর রাশিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউরোপের বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রপথিক। আধুনিক বুর্শোয়া সম্পত্তির আসন্ন অনিবার্য ধ্বংস ঘোষণাই ছিল *সাম্যবাদী ইশতেহার* এর লক্ষ্য। কিন্তু রাশিয়ায় আমরা পাই, একদিকে দ্রুত বিকাশমান পুঁজিবাদী জোচ্চুরী আর সদ্য বিকশিত হতে শুরু করা বুর্শোয়া ভুসম্পত্তির মুখোমুখি অর্ধেকের বেশী ভুমি রয়েছে কৃষকদের সাধারণ মালিকানাধীন। এখন প্রশ্ন হচ্ছেঃ, যদিও ব্যাপকভাবে দমিত, তথাপি ভুমির আদিম সাধারণ মালিকানার একটি ধরণ এই যে রুশ অবশ্চিনা (গ্রামীন সমাজ) তা কি সরাসরি উচ্চতর সাম্যবাদী সাধারণ মালিকানায় রূপান্তরিত হতে পারে? নাকি বিপরীতে সেই একই ধ্বংসের প্রক্রিয়ায় যাবে যা পশ্চিমে বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে?

এর একমাত্র যে উত্তর আজ সম্ভব তা হচ্ছেঃ যদি রুশ বিপ্লব পশ্চিমের সর্বহারা বিপ্লবের সংকেত হয়, যাতে উভয় উভয়ের পরিপূরক হয়, বর্তমান রুশ ভুমির সাধারণ মালিকানা একটা সাম্যবাদী বিকাশের সূচনা বিন্দু হিসেবে সেবা করতে পারে।

কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, লন্ডন, ২১ জানুয়ারী ১৮৮২

১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণের ভুমিকা

[টিকাঃ ইশতেহারের তৃতীয় জার্মান সংস্করণ]

বর্তমান সংস্করণের ভুমিকায় হায় আমাকে একাই স্বাক্ষর করতে হচ্ছে। যে মানুষটির প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকার সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী অন্য যে কারো চেয়ে বেশী ঋণী, তিনি হচ্ছেন মার্কস, আজ হাইগেট সমাধিতে চির বিশ্রামরত, আর তাঁর কবরে ইতিমধ্যেই বেড়ে উঠেছে প্রথম ঘাঁশ। তাঁর মৃত্যুর পর ইশতেহারের সংশোধন অথবা সংযুক্তির চিন্তা অনেক কম করা যায়। তাই এখানে স্পষ্টভাবে নিম্নলিখিত কথাগুলি আবার বলা আমি প্রয়োজন মনে করিঃ

ইশতেহারে প্রবহমান মূল চিন্তা হচ্ছে — প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগে যে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও তা থেকে সমাজের যে কাঠামো আবশ্যিকভাবে উদ্ভূত হয় তা ঐ যুগের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃদ্ধিক ইতিহাসের ভিত্তি গঠন করে; ফলতঃ সকল ইতিহাস (ভুমির আদিম সাধারণ মালিকানার বিলোপের পর থেকে) হয়ে এসেছে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে শোষিত ও শোষক, অধীনস্থ ও অধিপতি শ্রেণীসমূহের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস, আর এই সংগ্রাম এখন এমন স্তরে উপনীত হয়েছে যে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণী (সর্বহারা শ্রেণী) তাকে শোষণ ও নিপীড়ণকারী শ্রেণী (বুর্শোয়া)র কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনা একইসাথে সমগ্র সমাজকে শোষণ, নিপীড়ণ ও শ্রেণীসংগ্রাম থেকে চিরতরে মুক্ত না করে — এই মূল চিন্তাধারা সম্পুর্ণরূপে ও একমাত্র মার্কসেরই *[১৮৯০ এর জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকাঃ ইংরেজী অনুবাদের ভুমিকায় আমি এই প্রস্তাবনা লিখেছিলামঃ "ডারউইনের তত্ত্ব জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা করেছে আমার মতে এই সিদ্ধান্ত ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাই করতে বাধ্য। ১৮৪৫ এর আগেকার কয়েক বছর থেকে আমরা উভয়ে ক্রমান্বয়ে এর দিকে এগুচ্ছিলাম। আমি স্বতন্ত্রভাবে যতটুকু এর দিকে এগিয়েছিলাম তা আমার 'ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণীর ভুমিকা' বইয়ে সবচেয়ে ভালভাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমি যখন পুনরায় মার্কসের সাথে ব্রাসেলসে মিলিত হলাম ১৮৪৫-এর বসন্তে, তিনি ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন, আর আমার কাছে উপস্থাপন করলেন আমি যতটা এখানে ব্যক্ত করেছি প্রায় ততটা পরিষ্কারভাবেই।"]*

ইতিমধ্যে একথা আমি বহুবার বলেছি; কিন্তু ঠিক আজকেই এটা ইশতেহারের পুরোভাগেও যুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

ফ এঙ্গেলস, লন্ডন, ২৮ জুন ১৮৮৩

১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণের ভুমিকা

"ইশতেহার" প্রকাশিত হয়েছিল শ্রমজীবি মানুষের সমিতি "সাম্যবাদী লীগ"এর কর্মসূচি হিসেবে, যে সংগঠন প্রথমে ছিল পুরোপুরি জার্মান পরে আন্তর্জাতিক, ১৮৪৮ সালের আগেকার ইউরোপ মহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা ছিল অনিবার্যভাবে এক গোপন সমিতি। লন্ডনে ১৮৪৭ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত লীগের এক কংগ্রেসে মার্কস ও এঙ্গেলসকে ভার দেওয়া হয় এক পুর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পার্টি কর্মসুচি প্রকাশের জন্য রচনা করতে। জানুয়ারি ১৮৪৮ সালে জার্মান ভাষায় প্রস্তুত পান্ডুলিপিটি ২৪ ফেব্রুয়ারীর ফরাসী বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহ আগে লন্ডনে মুদ্রাকরের কাছে পাঠানো হয়। জুন ১৮৪৮ অভ্যুত্থানের সামান্য আগে প্যারিসে একটা ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। মিস হেলেন ম্যাকফারলেন কৃত প্রথম ইংরেজী অনুবাদ আবির্ভুত হল ১৮৫০ সালে লন্ডনে জর্জ জুলিয়ান হার্নের "লাল প্রজাতন্ত্রী (রেড রিপাবলিকান)" পত্রিকায়। একটা ড্যানিশ ও একটা পোলিশ সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল।

জুন ১৮৪৮ এর প্যারিসীয় অভ্যুত্থান — যা ছিল সর্বহারা শ্রেণী আর বুর্শোয়ার মধ্যে প্রথম বিরাট যুদ্ধ — এর পরাজয় ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খাকে আবারো কিছু সময়ের জন্য পেছনে হটিয়ে দিল। তারপর ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের আগেকার মত আবারো ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম সীমাবদ্ধ থাকল মালিক শ্রেণীগুলির মধ্যে; শ্রমিক শ্রেণীকে নেমে আসতে হয় রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে আর মধ্যবিত্ত র‍্যাডিক্যালদের চরমপন্থী অংশ রূপে দাঁড়াতে হয় তাদের। যেখানেই স্বাধীন সর্বহারা আন্দোলনে জীবনের চিহ্ন দেখা যেতে লাগল, সেখানেই তাকে নির্মমভাবে দমন করা হল। এভাবেই প্রুশীয় পুলিশ তখন কোলনে অবস্থিত কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় পরিষদের উপর হানা দিল। সদস্যদের গ্রেফতার করা হয় আর আঠার মাসের কারাবাসের পর তারা ১৮৫২ সালের অক্টোবরে বিচারের মুখোমুখি হন। এটা "কলোন সাম্যবাদীদের বিচার"*[টিকাঃ কলোন সাম্যবাদীদের বিচার ছিল প্রুশীয় সরকারের এক সাজানো বিচার]* নামে পরিচিতি পায় যা ৪ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত চলে, যাতে বন্দীদের মধ্যে সাত জনের তিন থেকে ছয় বছরের দুর্গ কারাবাস হয়। রায়ের পরপরই লীগের বাকি সদস্যগণ লীগকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙে দিলেন। *"ইশতেহার"* এর কথা বলা যায়, তা যেন বিস্মৃতিতে হারিয়ে গেল।

যখন ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণী শাসক শ্রেণীসমূহের উপর আরেকটা আক্রমণের জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় করে, তখন আবির্ভূত হয় শ্রমজীবি মানুষের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ। কিন্তু এই সঙ্ঘ ইউরোপ ও আমেরিকার সমগ্র জঙ্গি সর্বহারা শ্রেণীকে একটি একক সংগঠনের মধ্যে আনার ইচ্ছায় গঠিত বলে *"ইশতেহার"*-এ স্থাপিত মূল নীতি একবারে ঘোষণা করতে পারলনা। আন্তর্জাতিক বাধ্য ছিল এমন একটা উদার কর্মসূচি নিতে যা গ্রহণীয় হবে ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নের নিকট, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালি ও স্পেনে প্রুঁধোর অনুসারীদের নিকট, আর জার্মানীতে লাসালপন্থীদের নিকট। মার্কস এই কর্মসূচি রচনা করেন সকল পক্ষসমূহকে তুষ্ট করে *[এঙ্গেলসের টীকাঃ লাসাল ব্যক্তিগতভাবে সবসময় আমাদের কাছে মার্কসের শিষ্য হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন, তাই "ইশতেহার"-এর ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু তিনি ১৮৬২-৬৪ সময়কালে তার প্রথম প্রকাশ্য আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় ঋণ দ্বারা সমর্থিত সমবায় কারখানার দাবির বেশি এগোননি]* যৌথ তৎপরতা ও পারস্পরিক আলোচনা থেকে শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তিক যে বিকাশ ছিল সুনিশ্চিত, তার উপর তিনি পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন। পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঘটনাধারা ও বিপর্যয়সমূহ, বিজয়ের চেয়ে পরাজয়সমূহ, শ্রমিকদের মনে তাদের সাধের টোটকাগুলির অপর্যাপ্ততার উপলব্ধি আনয়ন না করে পারেনি, আর শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রকৃত শর্ত সম্পর্কে তার পুর্ণতর অন্তর্দৃষ্টি না এনে পারেনি। আর মার্কস ছিলেন সঠিক। ১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক গঠণের সময় শ্রমিকরা যেমন ছিল, আন্তর্জাতিক ১৮৭৪ সালে ভেঙে যাওয়ার পর তারা একেবারে ভিন্ন লোকে পরিণত হল। ফ্রান্সে প্রুঁধোবাদ, জার্মানীতে লাসালবাদ শুকিয়ে মরছিল, এমনকি রক্ষণশীল ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নগুলি, যদিও এদের প্রায় সবাই আন্তর্জাতিকের সাথে সম্পর্ক খারাপ করে তুলেছিল অনেক আগে থেকেই, সেই দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিল যাকে গত বছর সোয়ানশিতে তাদের সভাপতি তাদের নামে বলে, "ইউরোপ মহাদেশীয় সমাজতন্ত্র আমাদের কাছে আর বিভীষিকা নেই"। বস্তত, *"ইশতেহার"* এর নীতিমালা সকল দেশের শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে বেশ পরিমাণে ছড়িয়েছে।

এভাবে "ইশতেহার" নিজে আবারো সামনে চলে এল। ১৯৫০ সাল থেকে জার্মান পাঠ পুনমুদ্রিত হয় সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় বেশ কয়েকবার। ১৮৭২ সালে নিউইয়র্কে এটা ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হয় যা *"উডহল ও ক্লফিন-এর সাপ্তাহিক"*-এ প্রকাশিত হয় *[টিকাঃ বুর্শোয়া নারীবাদী ভিক্টোরিয়া উডহল ও টেনিসি ক্লফিন কর্তৃক ১৮৭০ থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্কে প্রকাশিত আমেরিকান পত্রিকা। পত্রিকাটি সাম্যবাদী পার্টির*

ইশতেহারের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করে তাদের ৩০ ডিসেম্বর ১৮৭১ সংখ্যায়]। এই ইংরেজী অনুবাদ থেকে নিউ ইয়র্কের "*সমাজতন্ত্রী*"তে একটা ফরাসী তৈরী করা হয়। তারপর থেকে কমপক্ষে আরো দুটি ইংরেজী অনুবাদ কমবেশী বিকৃত আকারে বের করা হয় আমেরিকায়, যার একটি ইংল্যান্ডে পুনমুদ্রিত হয়। বাকুনিন কর্তৃক প্রথম রুশ অনুবাদ ১৮৬৩ সালের দিকে জেনেভায় গের্তসেনের "কলোকল" দপ্তর প্রকাশ করে; দ্বিতীয় অনুবাদটিও জেনেভায় ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয় বীরনারী ভেরা জাসুলিচ কর্তৃক অনূদিত হয়ে *[টিকাঃ আগেই বলা হয়েছে যে ইশতেহারের দ্বিতীয় রুশ সংস্করণের প্রকৃত অনুবাদক ছিলেন গ ভ প্লেখানভ]*। ১৮৮৫ সালে এক নতুন ড্যানিশ সংস্করণ *[টিকাঃ এখানে যে ড্যানিশ অনুবাদের কথা বলা হচ্ছে তাতে কিছু বাদ পড়েছিল ও ভুল ছিল যা ইশতেহারের ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস তুলে ধরেছেন]* পাওয়া যায় কোপেনহেগেন-এর "*সমাজ গণতন্ত্রী গ্রন্থাগার*"-এ; একটা নতুন ফরাসী অনুবাদ প্যারিসে ১৮৮৬ সালে "*সমাজতন্ত্রী (লা সোশালিস্তে)*" পত্রিকায় পাওয়া যায় *[টিকাঃ সমাজতন্ত্রী পত্রিকায় ১৮৮৫ সালের ২৯ আগস্ট হতে ৭ নভেম্বর প্রকাশিত ফরাসী অনুবাদটি করেছিলেন লরা লাফার্গ। এটা ১৮৮৯ সালে প্যারিসে গ ত মের্মেইক্সের প্যারিসের ফরাসী সমাজতন্ত্রী পত্রিকার সংযুক্তি হিসেবেও প্রকাশিত হয়। সমাজতন্ত্রী ছিল ১৮৮৫ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯০২ সালের পূর্বে এটা ছিল ফরাসী শ্রমিক দলের মুখপত্র। ১৯০২ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তা ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক পার্টির আর ১৯০৫ সাল থেকে ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টির মুখপত্র ছিল। ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকে এঙ্গেলস পত্রিকাটিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন]*। এই শেষেরটা থেকে মাদ্রিদে একটা স্প্যানীয় সংস্করণ প্রস্তুত ও প্রকাশ হয় ১৮৮৬ সালে *[টিকাঃ স্পেনীয় অনুবাদ ১৮৮৬ সালের জুলাই থেকে আগষ্ট মাসে সমাজতন্ত্রী (এল সোশ্যালিস্তা) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একই বছর তা পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হয়]*। জার্মান পুনমুদ্রন অগনন, কমপক্ষে সবমিলিয়ে বারটি। একটা আর্মেনিয়ান অনুবাদ যা কনস্টান্টিনোপলে প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল কয়েক মাস আগে, তা আলোর মুখ দেখেনি। আমাকে বলা হল প্রকাশক মার্কসের নামে বই বের করতে ভয় পান, আর অনুবাদক তা নিজ সৃষ্ট হিসেবে দেখাতে অনিচ্ছুক। অন্যান্য ভাষায় আরো অনুবাদের কথা আমি শুনেছি, কিন্তু নিজের চোখে দেখিনি। এভাবে *"ইশতেহার"* এর ইতিহাস আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাসেরই প্রতিফলন ঘটায়; বর্তমানে নিঃসন্দেহে এটা সকল সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের মধ্যে সর্বাধিক বিস্তৃত আর সর্বাধিক আন্তর্জাতিক কীর্তি, সাইবেরিয়া থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত কোটি কোটি শ্রমজীবি মানষ কর্তৃক স্বীকৃত সাধারণ কর্মসূচি।

তথাপি, যখন এটা রচিত হয় একে সমাজতান্ত্রিক ইশতেহার বলা সম্ভব ছিল না। ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্রী বলতে বোঝাতো, একদিকে বহুবিধ ইউটোপীয় (কল্পনাশ্রয়ী) মততন্ত্রের অনুগামীদেরঃ ইংল্যান্ডে ওয়েনপন্থীরা, ফ্রান্সে ফুরিয়েপন্থীরা, উভয়ে স্রেফ একটা গোষ্ঠীতে ইতিমধ্যে সীমিত হয়ে এসে ক্রমান্বয়ে লোপ পাচ্ছিল; অন্যদিকে বোঝাত সমাজের বিচিত্র সব হাতুড়েদের যারা তাদের সকল প্রকার তুকতাক দ্বারা পুঁজি ও মুনাফার কোন ক্ষতি না করে সকল প্রকার সামাজিক অভিযোগের প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দিত, উভয় ক্ষেত্রের লোকেরাই ছিল শ্রমিক শ্রেণীর বাইরের, যারা "শিক্ষিত" শ্রেণীগুলির সমর্থনের দিকে তাকিয়ে ছিল। শ্রমিক শ্রেণীর যে অংশ মনে করেছে যে স্রেফ রাজনৈতিক বিপ্লব যথেষ্ট নয় আর এক সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তন আবশ্যক, সে অংশটা নিজেকে সাম্যবাদী বলত। এটা ছিল কাঁচা, অমার্জিত, নিতান্তই সহজবোধের সাম্যবাদ, তবু তা মূল প্রশ্নকে স্পর্শ করে, আর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এতটা শক্তিশালী ছিল যে এ থেকে জন্ম নেয় ফ্রান্সে কাবে-র আর জার্মানীর ভাইতলিং-এর কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্র। তাই, সমাজতন্ত্র ১৮৪৭ সালে ছিল একটা বুর্শোয়া আন্দোলন, সাম্যবাদ ছিল শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন। সমাজতন্ত্র ছিল ইউরোপ মহাদেশে অন্ততঃ "সম্মানিত"; আর সাম্যবাদ ছিল খুবই বিপরীত। আর যেহেতু আমাদের মত প্রথম থেকেই ছিল এই যে "শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর নিজেরই কাজ" *[টিকাঃ এই ধ্রুব সত্য মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৪০ দশক থেকে তাদের বেশ কিছু রচনায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে যে সূত্রায়ন করা হয়েছে তার জন্য দেখুন "শ্রমজীবি মানুষের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সাধারণ নিয়মাবলী"]*, তাই কোনই সন্দেহ ছিলনা এই দুই নামের মধ্যে আমরা কোনটা নেব। অধিকন্তু, আমরা আজ পর্যন্ত এ নাম বর্জন করার কথা ভাবিওনি।

ইশতেহার ছিল আমাদের যৌথ সৃষ্টি, তবু আমার মনে হয় আমি বলতে বাধ্য যে এর মর্ম গঠনকারী মূল বক্তব্য মার্কসেরই। সেই মূল বক্তব্য হলঃ প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বিনিময়ের পদ্ধতি ও তা থেকে যে সমাজের কাঠামো আবশ্যিকভাবে উদ্ভূত হয়, তা হচ্ছে একটা ভিত্তি যার উপর ঐ যুগের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃদ্ধিক ইতিহাস গড়ে উঠে ও একমাত্র তার দ্বারাই এর ব্যাখ্যা করা যায়; ফলতঃ সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস (ভুমির সাধারণ মালিকানা সম্বলিত আদিম উপজাতীয় সমাজের বিলোপের পর থেকে) হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, শোষক ও শোষিত, শাসক ও নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস, আর এই সংগ্রামের ইতিহাস হল বিবর্তনের এক ধারা যা আজকের দিনে এমন স্তরে উপনীত হয়েছে যেখানে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণী—সর্বহারা শ্রেণী—

তাকে শোষণ ও নিপীড়ণকারী শ্রেণী—বুর্শোয়া—থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনা সমগ্র সমাজকে সকল শোষণ, নিপীড়ণ, শ্রেণী পার্থক্য ও শ্রেণী সংগ্রাম থেকে চিরতরে মুক্ত না করে।

এই প্রস্তাবনা আমার বিবেচনায় ইতিহাসের জন্য তাই করেছে ডারউইনের তত্ত্ব জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা করেছে। ১৮৪৫ সালের কয়েক বছর আগে থেকে আমরা উভয়ে ক্রমন্বয়ে এর দিকে এগুচ্ছিলাম। আমি স্বাধীনভাবে যতটুকু এর দিকে এগিয়েছিলাম তা আমার 'ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণীর ভুমিকা' *[এঙ্গেলসের টীকাঃ ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা, রচনাঃ ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, অনুবাদঃ ফ্লোরেন্স কে উইশ্চেনতস্কি, নিউ ইয়র্ক, লোভেল—লন্ডন। ডব্লিউ রীভস, ১৮৮৮]* বইয়ে সবচেয়ে ভালভাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমি যখন পুনরায় মার্কসের সাথে ব্রাসেলসে মিলিত হলাম ১৮৪৫ সালের বসন্তে, তিনি এটা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করে ফেলেছেন আর আমার কাছে উপস্থাপন করলেন, এখন আমি যতটা পরিষ্কারভাবে এখানে ব্যক্ত করেছি ততটাই।

১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণে আমাদের যৌথ ভূমিকা থেকে আমি এখানে উদ্ধৃত করতে চাই নিচের অংশটিঃ

"বিগত পঁচিশ বছরে অনেক ওলট পালট ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু *ইশতেহারে* স্থাপিত মৌলিক নীতিমালা সামগ্রিকভাবে আজকেও একই আছে। এখানে সেখানে কিছু বিস্তারিত ব্যাখার উন্নতি হয়েছে। *ইশতেহার* যেমনটা বলেছে, সবক্ষেত্রে ও সকল সময়ে নীতিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করছে সে সময়ের ঐতিহাসিক অবস্থার উপর, আর তাই, দ্বিতীয় অংশের শেষে কোন বিপ্লবী পদক্ষেপ প্রস্তাবিত হয়নি। আজকে ঐ অনুচ্ছেদটি অনেক দিক থেকেই খুবই ভিন্নভাবে লিখতে হত। বিগত পঁচিশ বছরে আধুনিক শিল্পের বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি সংগঠনগুলি আরো বিকশিত ও প্রসারিত হয়েছে *[টিকাঃ **১৮৭২** সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় এই বক্তব্যকে কিছুটা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে]* প্রথমে ফ্রেব্রুয়ারী বিপ্লবে তারপর তার চেয়ে আরো বেশি করে সেই প্যারী কমিউনে যেখানে সর্বহারা শ্রেণী সর্বপ্রথম দুই মাসের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল, ইত্যাদি প্রেক্ষিতে ইশতেহারের কর্মসূচি কিছু বিস্তারিতর দিক থেকে সেকেলে হয়ে গেছে। কমিউন বিশেষভাবে এই জিনিসটা প্রমাণ করেছে যে "শ্রমিক শ্রেণী তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটার কেবল দখল বজায় রেখেই নিজের উদ্দেশ্য সাধনে তা ব্যবহার করতে পারেনা।"(দেখুন ফান্সে গৃহযুদ্ধ; আর আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা, লন্ডন, ট্রুলাভ, ১৮৭১, পৃঃ ১৫-

এ এই পয়েন্টটাকে আরো বিকশিত করা হয়েছে)। এটা আরো স্বতসিদ্ধ যে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের সমালোচনা আজকের দিনের তুলনায় কম আছে, কারণ সেটা ছিল কেবল ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত; একইভাবে বিভিন্ন বিরোধী পার্টির সাথে সাম্যবাদীদের সম্পর্কের উপর মন্তব্য (চতুর্থ অধ্যায়ে) যদিও নীতিগতভাবে এখনো সঠিক, তবু ব্যবহারিকভাবে সেকেলে হয়ে গেছে, কেননা রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমগ্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, আর ইতিহাসের প্রগতি অধিকাংশ রাজনৈতিক পার্টিকেই ঝেটিয়ে বিদায় করেছে।

কিন্তু *ইশতেহার* একটা ঐতিহাসিক দলিল হয়ে গেছে যার পরিবর্তন করার কোন অধিকার আর আমাদের নেই।"

মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থের বেশির ভাগের অনুবাদক জনাব স্যামুয়েল মুর এই অনুবাদ করেছেন। আমরা দুজনে মিলে এর সংশোধন করেছি। কয়েকটি ঐতিহাসিক উল্লেখের ব্যাখ্যা হিসেবে কিছু টীকা আমি সংযোজন করেছি।

ফ এঙ্গেলস

লন্ডন, ৩০ জানুয়ারী ১৮৮৮

১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকা

[টিকাঃ ১৮৯০ সালে লন্ডনে প্রকাশিত চতুর্থ জার্মান সংস্করণের জন্য এঙ্গেলস এই ভূমিকা লেখেন "সমাজতন্ত্রী গ্রন্থাগার (সোশিওদেমোক্রাতিশ্চ বিব্লিওথেক)" ধারাবাহিকের অংশ হিসেবে]

উপরের কথাগুলো লেখার পর *[টিকাঃ এখানে এঙ্গেলস ১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণে তার ভূমিকার কথা বলছেন]*, ইশতেহারের একটা নতুন জার্মান সংস্করণ আবারো প্রয়োজন হয়েছে, আর ইশতেহারের অনেক কিছু ঘটে গেছে যার বিবরণী এখানে থাকা দরকার।

১৮৮২ সালে ভেরা জাসুলিচ কর্তৃক দ্বিতীয় রুশ অনুবাদ আবির্ভূত হয় জেনেভায় ১৮৮২ সালে; ঐ সংস্করণের ভূমিকা মার্কস আর আমি লিখেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত, মূল জার্মান পান্ডুলিপি ধ্বংস হয়ে গেছে; আমাকে তাই রুশ থেকে পুন অনুবাদ করতে হবে, যা কোন ভাবেই পাঠকে উন্নত করবে না *[টিকাঃ ইশতেহারের রুশ সংস্করণের মার্কস ও এঙ্গেলসের ভূমিকার মূল পাণ্ডুলিপি অবশেষে পাওয়া গেছে। রুশ থেকে জার্মানে পুন অনুবাদের ক্ষেত্রে এঙ্গেলস এতে সামান্য পরিবর্তন করেন]*। এতে লেখা আছেঃ

"বাকুনিন কর্তৃক অনূদিত কলোকল মুদ্রন কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে সাম্যবাদী ইশতেহারের প্রথম রুশ সংস্করণ ষাটের দশকের শুরুতে প্রকাশিত হয়। তারপর পশ্চিমারা কেবল এর মধ্যে (ইশতেহারের রুশ সংস্করণে) দেখে থাকতে পারে সাহিত্যিক কৌতুহল-বস্তু মাত্র। এরকম একটি দৃষ্টিভঙ্গি আজকে অসম্ভব।

সেসময় সর্বহারা শ্রেণী কতটাই না সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র দখল করে ছিল (ডিসেম্বর ১৮৪৭) তা সর্বাধিক পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে ইশতেহারের শেষ অংশঃ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিরোধী পার্টিসমূহের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে সাম্যবাদীদের অবস্থান। রাশিয়া আর মার্কিন যুক্তরাষ্টের কথাই নেই এখানে। এটা ছিল এমন একটা সময় যখন রাশিয়া ছিল সকল ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার সর্বশেষ বৃহৎ রিজার্ভ যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসনের মাধ্যমে ইউরোপ থেকে উদ্বৃত্ত সর্বহারা শক্তিসমূহ শুষে নিয়েছে। উভয় দেশই ইউরোপকে কাঁচামাল সরবরাহ করত আর ইউরোপের শিল্পজাত সামগ্রীর বিক্রয়ের বাজার ছিল। সেসময় উভয় দেশই ছিল কোন না কোন ভাবে বিদ্যমান ইউরোপীয় ব্যবস্থার ভিত্তি।

আজকে কতই না ভিন্ন! ইউরোপীয় অভিবাসনই উত্তর আমেরিকাকে এক অতিকায় কৃষি উৎপাদনের যোগ্য করে তুলেছে, যার প্রতিযোগিতা ইউরোপীয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নির্বিশেষে ভুমি

সম্পত্তির খোদ ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তার সাথে এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সক্ষম করে তুলেছে তার বিপুল শিল্প সম্পদকে এমন এক শক্তি ও মাত্রায় কাজে লাগাতে যা অচিরেই শিল্প ক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপের বিশেষত ইংল্যান্ডের আজ পর্যন্ত যে একচেটিয়া রয়েছে তাকে ভেঙে ফেলবে। উভয় পরিস্থিতি খোদ আমেরিকার উপরই বিপ্লবী উপায়ে প্রতিক্রিয়া করে। সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি যে কৃষকদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ভুমি মালিকানা তা ক্রমে ক্রমে অতিকায় খামারগুলোর প্রতিযোগিতার কাছে হার মানছে; একইসাথে শিল্পাঞ্চলগুলোতে ব্যাপক সর্বহারা শ্রেণীর সমাবেশ ঘটছে আর বিপুল পুঁজির কেন্দ্রীভবন ঘটছে প্রথমবারের মত।

আর এখন রাশিয়া! ১৮৪৮-৪৯ এর বিপ্লবের সময় ইউরোপীয় রাজন্যবর্গই শুধু নয়, ইউরোপীয় বুর্শোয়ারাও সদ্য জাগরণরত সর্বহারা শ্রেণীর হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ খুঁজে পেয়েছিল রুশ হস্তক্ষেপের মধ্যে। জারকে ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার সর্দার ঘোষণা করা হয়েছিল। আজ সে গ্যাচিনায় বিপ্লবের কাছে যুদ্ধবন্দীর মত। আর রাশিয়া হয়েছে ইউরোপের বিপ্লবী তৎপরতার অগ্রপথিক।

সাম্যবাদী ইশতেহার ঘোষণা করেছিল আধুনিক বুর্শোয়া সম্পত্তির অনিবার্য ধ্বংস। কিন্তু রাশিয়ায় আমরা পাই, দ্রুত বিকাশমান পুঁজিবাদী জুয়াচুরি আর সদ্য বিকাশমান বুর্শোয়া ভুসম্পত্তির মুখোমুখি অর্ধেকের বেশী ভুমি কৃষকদের সাধারণ মালিকানাধীন। এখন প্রশ্ন হচ্ছেঃ যদিও ব্যাপকভাবে দমিত তথাপি ভুমির আদিম সাধারণ মালিকানার একটি ধরণ এই যে রুশ অবশ্চিনা [গ্রামীণ সমাজ], তা কি সরাসরি উচ্চতর সাম্যবাদী সাধারণ মালিকানার দিকে যাবে? নাকি বিপরীতে পশ্চিমের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা গঠনকারী একই ধ্বংসের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে?

এর একমাত্র যে উত্তর আজ সম্ভব তা হচ্ছেঃ যদি রুশ বিপ্লব পশ্চিমের সর্বহারা বিপ্লবের সংকেত হয়, যাতে উভয় উভয়ের পরিপূরক হয়, বর্তমান রুশ ভুমির সাধারণ মালিকানা একটা সাম্যবাদী বিকাশের সূচনা বিন্দু হিসেবে সেবা করতে পারে।

কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, লন্ডন, ২১ জানুয়ারী ১৮৮২"

প্রায় একই তারিখে জেনেভায় একটি নতুন পোলীয় সংস্করণ আবির্ভূত হয়ঃ মেনিফেস্ত কম্যুনিস্তিজনি (সাম্যবাদী ইশতেহার)।

এক নতুন ড্যানিশ সংস্করণ পাওয়া যায় ১৮৮৫-এ কোপেনহেগেন-এর "সমাজগণতন্ত্রী গ্রন্থাগার (সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক বিব্লিওথেক)"-এ; দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটা সম্পূর্ণ ছিলনা; কিছু জরুরী অনুচ্ছেদ যা অনুবাদকের কাছে কঠিন মনে হয়েছে তা বাদ দেয়া হয়েছে, আর

তার উপর যত্নের অভাব এখানে ওখানে দেখা যায়, এসবই দুঃখজনকভাবে লক্ষ্যনীয় যা এই ইঙ্গিত দেয় যে অনুবাদক যদি আর একটু কষ্ট করতেন তিনি একটা চমৎকার কর্ম সম্পাদন করতে পারতেন।

একটা নতুন ফরাসী অনুবাদ প্যারিসে ১৮৮৬ সালে "সমাজতন্ত্রী (লা সোশ্যালিস্ত)"-এ প্রকাশিত হয়। আজ পর্যন্ত এটাই শ্রেষ্ঠ সংস্করণ।

এই ফরাসী থেকে পরে মাদ্রিদে একটা স্প্যানিশ সংস্করণ প্রস্তুত ও প্রকাশ হয় একই বছর প্রথমে মাদ্রিদের সমাজতন্ত্রী (এল সোশ্যালিস্তা) পত্রিকায়, আর তারপর পুস্তিকা আকারে পুন প্রকাশিত হয়ঃ সাম্যবাদী পার্টির ইশতেহার, রচনাঃ কার্ল মার্কস ও ফ এঙ্গেলস প্রকাশকঃ সমাজতন্ত্রী (এল সোশ্যালিস্তা), মাদ্রিদ, আর্নান কর্তেস ৮।

একটা মজার ব্যাপার হিসেবে আমি উল্লেখ করতে পারি যে একটা আর্মেনিয়ান অনুবাদ কনস্টান্টিনোপলে এক প্রকাশকের কাছে প্রকাশনার জন্য দেয়া হয়। কিন্তু ভালমানুষটি মার্কসের নাম বহনকারী বই বের করতে সাহস পেলনা, আর সে অনুবাদককে পরামর্শ দিল সে যেন লেখক হিসেবে নিজের নাম দেখায়—যাতে অনুবাদক রাজি হলেন না।

প্রথমে একটি তারপর আরেকটি কমবেশী খুঁতযুক্ত আমেরিকান অনুবাদ বারংবার ইংল্যান্ডে পুনমুদ্রিত হল। সবশেষে ১৮৮৮ সালে একটা সঠিক সংস্করণ বের হল। অনুবাদ করেন আমার বন্ধু স্যামুয়েল মুর, আর ছাঁপাখানায় যাওয়ার আগে আমরা দুজনে মিলে আরেকবার এটা দেখেছি। এর শিরোনাম ছিলঃ কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস কর্তৃক। লেখক কর্তৃক অনুমোদিত ইংরেজী অনুবাদ। ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস কর্তৃক সম্পাদিত ও টীকাযুক্ত। ১৮৮৮, লন্ডন, উইলিয়াম রীভস, ১৮৫ ফ্লিট স্ট্রীট, ইসি। আমি বর্তমান সংস্করণে সেই সংস্করণের কিছু টীকা অন্তর্ভুক্ত করেছি।

ইশতেহারের একটা নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে। প্রকাশের সময় তখনো সংখ্যায় বিপুল নয় এমন অগ্রগামী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী কর্তৃক উৎসাহভরে গৃহীত হয়েছিল (একথা প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় যেসব অনুবাদের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা প্রমাণিত হয়), শীঘ্রই তা জুন ১৮৪৮-এ প্যারিসীয় শ্রমিকদের পরাজয়ের ফলস্বরূপ প্রতিক্রিয়া কর্তৃক পশ্চাদে নিক্ষিপ্ত হয়, আর শেষ পর্যন্ত নভেম্বর ১৮৫২ সালে কলোন সাম্যবাদীদের বিচারের মাধ্যমে "আইন অনুসারে" নিষিদ্ধ হয়। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল যে শ্রমিক আন্দোলন তা লোকচক্ষু থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে *ইশতেহার*ও অন্তরালে চলে গেল।

যখন ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণী শাসক শ্রেণীর ক্ষমতার উপর নতুন আক্রমণ হানার মত যথেষ্ট শক্তি পুনরায় অর্জন করল, শ্রমজীবি মানুষের আন্তর্জাতিক সংঘ উদ্ভূত হল। এর লক্ষ্য ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার সমগ্র জঙ্গী শ্রমিক শ্রেণীকে এক বিরাট বাহিনীতে সুসংহত করা। তাই ইশতেহারে স্থাপিত নীতিমালার উপর এটা *দাঁড়াতে* পারলনা। এটা বাধ্য ছিল এমন এক কর্মসূচী নিতে যা দরজা বন্ধ রাখবেনা ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নগুলির জন্য, ফরাসী, বেলজীয়, ইতালীয়, স্প্যানীয় প্রুঁধোপন্থী আর জার্মান লাসালপন্থীদের জন্য *[এঙ্গেলসের নোটঃ লাসাল ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কাছে সবসময়ই মার্কসের একজন 'শিষ্য' হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন, আর সেই হিসেবে, ইশতেহারই তার মতের ভিত্তি। তার অনুসারীদের কথা সম্পূর্ণ আলাদা যারা তার রাষ্ট্রীয় সমর্থিত উৎপাদকদের সমবায়ের দাবির বাইরে যায়নি আর যারা সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার সমর্থক আর আত্মসহায়তার সমর্থক এই দুইয়ে বিভক্ত করে]*। এই কর্মসূচী – আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলীর ভূমিকা মার্কস এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ হাতে রচনা করেলেন যা বাকুনিন ও নৈরাজ্যবাদীরা পর্যন্ত স্বীকার করে। ইশতেহারে স্থাপিত ভাবধারার চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য মার্কস একমাত্র ও শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের উপর নির্ভর করেছিলেন, ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতা ও আলোচনা থেকে যার উদ্ভব ছিল অনিবার্য। পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঘটনাধারা ও বিপর্যয়সমূহ, সফলতার চেয়ে এমনকি পরাজয়সমূহ যোদ্ধাদের কাছে তাদের এতদিনকার টোটকা ঔষধের অপর্যাপ্ততা না দেখিয়ে পারেনা আর তাদের মনকে অধিকতর গ্রহণমুখী করে তোলে শ্রমিকদের মুক্তির জন্য সত্যিকার শর্তসমূহের সামগ্রিক উপলব্ধিতে। আর মার্কস ছিলেন সঠিক। ১৮৭৪ সালের আন্তর্জাতিকের ভেঙে দেওয়ার সময়কার শ্রমিক শ্রেণী ১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার সময়ের শ্রমিক শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে উঠে। প্রুঁধোবাদ লাতিন দেশগুলিতে আর জার্মানীর স্বকীয় লাসালবাদ শুকিয়ে মরছিল, আর এমনকি তখনকার চরম রক্ষণশীল ইংরেজ ট্রেড ইউনিয়নগুলি এমন একটা বিন্দুর দিকে এগুচ্ছিল যেখানে ১৮৮৭ সালে তাদের সোয়ানশি কংগ্রেসের সভাপতি তাদের পক্ষ থেকে বলেঃ "ইউরোপ মহাদেশীয় সমাজতন্ত্র আমাদেরকে কাছে আর বিভীষিকা নেই।" তথাপি ১৮৮৭ সালে ইউরোপ মহাদেশীয় সমাজতন্ত্র ছিল *ইশতেহার* কর্তৃক তুলে ধরা তত্ত্ব মাত্র। তাই, কিছু পরিমাণে, ইশতেহারের ইতিহাস ১৮৪৮ সাল থেকে আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসকেই প্রতিফলিত করে। বর্তমানে নিঃসন্দেহে এটা সকল সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের

মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত, সর্বাধিক আন্তর্জাতিক সৃষ্টি, সাইবেরিয়া থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত সকল দেশের কোটি কোটি শ্রমিকের স্বীকৃত সাধারণ কর্মসূচি।

তবুও, যখন এটা রচিত হয় আমরা একে *সমাজতান্ত্রিক*ইশতেহার বলতে পারতাম না। ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্রী বলতে বোঝাতো দুই ধরণের লোককে। একদিকে বহুবিধ কল্পনাশ্রয়ী মততন্ত্রের অনুগামীরা যথা, ইংল্যান্ডে ওয়েনপন্থীরা, ফ্রান্সে ফুরিয়েপন্থীরা, অবশ্য উভয়ে স্রেফ একটা গোষ্ঠীতে ইতিমধ্যে সীমিত হয়ে ততদিনে ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে মরছিল। অন্যদিকে, সমাজের নানা বিচিত্র সব হাতুড়েরা তাদের সকল প্রকার সর্বরোগহর টোটকা ঔষধ ও জোড়াতালি দ্বারা সামাজিক অবিচারের অবসানের কথা বলে পুঁজি ও মুনাফার সামান্যতম ক্ষতি না করে। উভয় ক্ষেত্রের লোকেরাই ছিল শ্রমিক শ্রেণীর বাইরের, যারা "শিক্ষিত" শ্রেণীগুলির সমর্থনের দিকে তাকিয়ে ছিল। স্রেফ রাজনৈতিক বিপ্লব যথেষ্ট নয় এটা নিশ্চিত হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর যে অংশ সেদিন সমাজের আমূল পুনর্গঠনের দাবি তোলে, সে অংশটা সেসময় নিজেকে *কমিউনিস্ট (সাম্যবাদী)* বলত। এটা ছিল অমার্জিত, নিতান্ত সহজবোধের, প্রায়শই অনেকটা স্থূল সাম্যবাদ মাত্র। তথাপি কল্পনাশ্রয়ী সাম্যবাদের দুটি ধারা সৃষ্টি করার মত শক্তি এর ছিলঃ ফ্রান্সে কাবের "আইকেরীয়" সাম্যবাদ আর জার্মানীতে ভাইতলিং-এর সাম্যবাদ। তাই, সমাজতন্ত্র ১৮৪৭ সালে ছিল একটা বুর্শোয়া আন্দোলন, সাম্যবাদ ছিল শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন। সমাজতন্ত্র ছিল ইউরোপ মহাদেশে অন্ততঃ "ভদ্রস্থ"; আর সাম্যবাদ ছিল খুবই বিপরীত। আর যেহেতু আমাদের দৃঢ় মত প্রথম থেকেই ছিল এই যে "শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর নিজেরই কাজ", তাই আমাদের কোনও দ্বিধা ছিলনা এই দুই নামের মধ্যে আমরা কোনটা নেব। আমরা আজ পর্যন্ত এ নাম বর্জন করার কথা ভাবিওনি।

"দুনিয়ার মজদুর এক হও!" আজ থেকে বিয়াল্লিশ বছর আগে প্রথম যে প্যারিস বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণী তার নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে দাঁড়ালো, ঠিক তারই পূর্বক্ষণে আমরা যখন পৃথিবীর সামনে এই কথা ঘোষণা করেছিলাম, সেদিন অল্প কিছু কণ্ঠেই তার প্রতিধ্বনি উঠেছিল। ১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশের সর্বহারা শ্রেণী হাত মেলালো আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি সংঘের সাথে, যে সংঘ এক গৌরবোজ্বল স্মৃতির। এটা সত্যি যে আন্তর্জাতিক টিকে ছিল কেবল নয় বছর। কিন্তু এটা সারা দুনিয়ার সর্বহারা শ্রেণীর যে চিরন্তন ঐক্য সৃষ্টি করেছিল তা এখনো জীবন্ত, আর যে কোন সময়ের চেয়ে শক্তিশালী, আজকের দিনই তার সর্বোত্তম স্বাক্ষী। কারণ আজকে আমি যখন এই লাইনগুলি লিখছি, ইউরোপীয় ও

আমেরিকান সর্বহারা শ্রেণী তার যুদ্ধ ক্ষমতা বিচার করে দেখছে, প্রথমবারের মত তারা সমাবেশিত, সমাবেশিত একটি একক বাহিনী হিসেবে, একটি একক পতাকার নীচে, একটি আশু লক্ষ্যেঃ যা আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেস ১৮৬৬ সালে ঘোষণা করেছে, আর আবারো ১৮৮৯ সালে প্যারিস শ্রমিক কংগ্রেস ঘোষণা করেছে *[টিকাঃ প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেস ১৮৬৬ সালের ৩-৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ ও বিভিন্ন অংশ আর সেইসাথে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও সুইজারল্যান্ডের শ্রমিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে ষাটজন প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। হারম্যান ইয়াং এতে সভাপতিত্ব করেন। সাধারণ পরিষদের দলিল হিসেবে মার্কসের "অস্থায়ী সাধারণ পরিষদের প্রতি নির্দেশনাঃ সাধারণ সমস্যাবলী" কংগ্রেসে পঠিত হয়। আলোচ্যসূচির সকল বিষয়বস্তু নিয়ে গঠিত এক বিশদ কর্মসূচি মার্কসের "নির্দেশনাবলী"কে প্রুঁধোপন্থীরা এক তৃতীয়াংশ ভোটসহকারে বিরোধিতা করে। যাইহোক, আলোচিত সকল বিষয়গুলির অধিকাংশেই সাধারণ পরিষদের সমর্থকগণ জয়ী হন। "নির্দেশনাবলী"র নয়টি ধারার মধ্যে ছয়টি ধারা কংগ্রেস গ্রহণ করে। তার মধ্যে ছিলঃ আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতা, আট ঘণ্টা কর্মদিবসের আইনপ্রণয়নের সূচনা, নারী ও শিশু শ্রম, সমবায় শ্রম, ট্রেড ইউনিয়ন ও স্থায়ী সেনাবাহিনী প্রশ্ন। জেনেভা কংগ্রেস শ্রমজীবি মানুষের আন্তর্জাতিক সংঘের গঠণতন্ত্রও অনুমোদন করে।*

প্যারিস শ্রমিক কংগ্রেস—আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক কংগ্রেস ১৮৮৯ সালের ১৪-২০ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়। এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা কংগ্রেস। ফরাসী সুবিধাবাদী সম্ভাবনাবাদীরা আর ব্রিটিশ সমাজ গণতন্ত্রী ফেডারেশনের মধ্যেকার তাদের অনুসারীরা কংগ্রেস কব্জা করার, এর নেতৃত্ব দখল করার আর মার্কসবাদের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের এক নতুন ঐক্য গড়ে তোলায় বাঁধা দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু এঙ্গেলসের সরাসরি নেতৃত্বে মার্কসবাদীরা তাদের বিরুদ্ধে এক অব্যাহত সংগ্রাম চালায়। ১৮৮৯ সালের ১৪ই জুলাই যখন কংগ্রেসের উদ্বোধন হয় তা ছিল বাস্তিল দুর্গের উপর আক্রমণের শতবার্ষিকী, আর মার্কসবাদী পার্টিগুলো ইতিমধ্যে প্রধান হয়ে গেছে। কংগ্রেসে উপস্থিত ৩৯৩ প্রতিনিধির মধ্যে ২০ জন ছিল ইউরোপীয় ও আমেরিকার দেশগুলি থেকে। সম্ভাবনাবাদীরা তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর প্যারিসে একই দিন আরেকটি পাল্টা কংগ্রেস আহবান করে মার্কসবাদী কংগ্রেসকে বিরোধিতা করে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদেশী প্রতিনিধি সম্ভাবনাবাদীদের কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল, আর তাদের অধিকাংশই ছিল ভুয়া প্রতিনিধি। পৃ২৫

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক পার্টিসমূহের প্রতিনিধিদের কাছে নিজ নিজ দেশের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের রিপোর্ট শ্রবণ করে, আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের মূলনীতিমালা প্রণয়ন করে, আটঘন্টা কর্মদিবসের আইন বাস্তবায়নের দাবি গ্রহণ করে এবং শ্রমিকরা কীভাবে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে তা ব্যাখ্যা করে। কংগ্রেস সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং শ্রমিকদের রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়। কংগ্রেস স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বিলোপ আর জনগণের সার্বজনীন সশস্ত্রকরণের প্রস্তাব তুলে ধরে। কংগ্রেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক উৎসব হিসেবে ১লা মে উদযাপন করারার জন্য সকল দেশের শ্রমিকদের আহবান করা]। সেইভাবেই আট ঘন্টা কর্মদিবসের আইন পাশ করে তা চালু করতে হবে। আর আজকের দিনের দৃশ্য দুনিয়ার পুঁজিবাদী ও ভুস্বামীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে সত্যিই সকল দেশের শ্রমিকেরা এক হয়েছে।

আমার পাশে থেকে এটা নিজের চোখে দেখার জন্য মার্কস যদি আজকে জীবিত থাকতেন!

ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস, লন্ডন, ১ মে ১৮৯০

১৮৯২ সালের পোলীয় সংস্করণের ভূমিকা

[টিকাঃ এঙ্গেলস জার্মান ভাষায় এই ভূমিকা লেখেন ইশতেহার-এর নতুন পোলিশ সংস্করণের জন্য যা ১৮৯২ সালে লন্ডনে পোলীয় সমাজতান্ত্রিকদের দ্বারা পরিচালিত প্রভাত (শেজুইথ) প্রকাশনা প্রকাশ করে। শেজুইথ প্রকাশনার কাছে ভূমিকা প্রেরণ করার পর এঙ্গেলস ১৮৯২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী স্টেইনলো মেন্ডেলসনের কাছে লেখেন যে তিনি পোলীয় ভাষা শিখতে চান আর তিনি পোল্যান্ডের শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশকে অধ্যয়ন করতে চান যাতে ইশতেহার-এর পরবর্তী পোলীয় সংস্করণের জন্য আরো বিস্তারিত ভূমিকা লিখতে পারেন]

সাম্যবাদী ইশতেহারের যে একটা নতুন পোলীয় সংস্করণের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে অনেক কথা মনে আসে।

সর্বাগ্রে এটা উল্লেখ্য যে *ইশতেহার* যেন ইদানিং ইউরোপ মহাদেশে বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশের একটা সূচকে পরিণত হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট দেশে যে অনুপাতে বৃহদায়তন শিল্প সম্প্রসারিত হয়, সেই অনুপাতে সেদেশের শ্রমিকদের মধ্যে মালিক শ্রেণীর তুলনায় শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান সংক্রান্ত জ্ঞানলাভের আকাঙ্খা বাড়ে, তাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিস্তৃত হয় আর ইশতেহারের চাহিদা বাড়ে। তাই, কোন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থাই শুধু নয় বরং বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশও অনেকটা নিঃখুঁতভাবে মাপা যায় সেদেশের ভাষায় কত কপি ইশতেহার প্রচারিত হয়েছে তার দ্বারা।

সে হিসেবে, নয়া পোলীয় সংস্করণ পোলীয় শিল্পের একটা নিশ্চিত অগ্রগতির ইঙ্গিত করে। আর এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা যে দশ বছর আগে যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকে এই প্রগতি সতিই ঘটেছে। রুশী পোল্যান্ড অর্থাৎ কংগ্রেস পোল্যান্ড *[টীকাঃ কংগ্রেস পোল্যান্ড পোলীয় রাজ্য নামে ১৮১৪-১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাশিয়ার কাছে হস্তান্তরিত হয়]* রুশ সাম্রাজ্যের বৃহৎ শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। যেখানে রুশ বৃহদায়তন শিল্প বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে – একটা অংশ ফিনল্যান্ডের উপসাগরের চারদিকে, আরেকটি অংশ কেন্দ্রে (মস্কো ও ভ্লাদিমির), তৃতীয় অংশ কৃষ্ণ ও আজভ সাগরের তীর জুড়ে, আর অন্যগুলো অন্যত্র – পোলীয় শিল্প তুলনামূলক ছোট এলাকায় চেপে গেছে আর এরকম কেন্দ্রীভবন থেকে উদ্ভূত সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই সে ভোগ করে। পোলীয়দের রুশীতে রূপান্তর করার তাদের প্রচণ্ড আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও

প্রতিযোগী রুশ শিল্পমালিকরা যখন পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে রক্ষন শুল্ক আরোপ করে তখন তারা এই সুবিধার ব্যাপারটাই স্বীকৃতি দেয়। পোলীয় শিল্পমালিক ও রুশ সরকার উভয়ের জন্যই অসুবিধা প্রতিফলিত হয় পোলীয় শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার দ্রুত ছড়িয়ে পড়া আর ইশতেহারের জন্য বাড়ন্ত চাহিদার মধ্যে।

কিন্তু পোলীয় শিল্পের যে দ্রুত বিকাশ রাশিয়াকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে তা আবার পোলীয় জনগণের অফুরান প্রাণশক্তির প্রকাশ আর ঝুলে থাকা জাতীয় পুনপ্রতিষ্ঠার নতুন নিশ্চয়তা। আর একটি স্বাধীন শক্তিশালী পোল্যান্ডের পুনপ্রতিষ্ঠা শুধু পোলীয়দের চিন্তার বিষয় নয় বরং আমাদেরও। ইউরোপীয় জাতিসমূহের আন্তরিক আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্ভব কেবল যদি এই জাতিসমূহ নিজেদের দেশে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত হয়। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব সর্বহারা শ্রেণীর পতাকার অধীনে সংঘটিত হলেও, শেষ পর্যন্ত সর্বহারা যোদ্ধাদেরকে বুর্শোয়াদের কাজটাই কেবল করতে হয়েছে, ইতালী, জার্মান ও হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা অর্জিত হয় তার পবিত্র কর্মসম্পাদক লুই বোনাপার্ট ও বিসমার্কের মাধ্যমে; কিন্তু পোল্যান্ড যে কিনা ১৭৯২ হতে এই বিপ্লবের জন্য ঐ তিন দেশের চেয়ে বেশি করেছে, ১৮৬৩ সালে দশগুণ শক্তিশালী রুশ বাহিনীর গ্রাসে পড়ার সময় তার নিজ সম্পদের উপরই কেবল তাকে ভরসা করতে হয়। অভিজাত সম্প্রদায় না তো পোলীয় স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারত, না তা পুন অর্জন করতে পারত; আজকে বুর্শোয়ার কাছে, কম করে বললেও, সে স্বাধীনতা হচ্ছে অবাস্তব। তাসত্ত্বেও ইউরোপীয় জাতিসমূহের সুষম সহযোগিতার জন্য এটা প্রয়োজন। তা কেবল অর্জন করা যেতে পারে তরুণ পোলীয় সর্বহারা শ্রেণী কর্তৃক, আর তার হাতেই এটা নিরাপদ। বাকী ইউরোপের শ্রমিকদের পোল্যান্ডের স্বাধীনতা ততটাই প্রয়োজন যতটা পোলীয় শ্রমিকদের নিজেদের প্রয়োজন।

ফ এঙ্গেলস

লন্ডন, ১০ ফেব্রুয়ারী ১৮৯২

১৮৯৩ সালের ইতালীয় সংস্করণের ভূমিকা

ইতালীয় পাঠকদের প্রতি

[টীকাঃ ইতালীয় সমাজতন্ত্রী নেতা ফিলিপ্পো তুরাতির অনুরোধে এঙ্গেলস ইশতেহার-এর ইতালীয় সংস্করণের ভূমিকা ফরাসী ভাষায় লেখেন "ইতালীয় পাঠকদের প্রতি" মূল শিরোনামে]

সাম্যবাদী পার্টির ইশতেহার এর প্রকাশনা ১৮ মার্চ ১৮৪৮ আকস্মিকভাবে মিলে যায় একই দিন সঙ্ঘটিত মিলান ও বার্লিনের বিপ্লবের সাথে যা ছিল দুটি জাতির সশস্ত্র অভ্যুত্থান, যার একটি ইউরোপ মহাদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত, অন্যটি ভূমধ্যসাগরের মধ্যস্থলে; সেসময় পর্যন্ত দুই জাতি ভাঙন ও অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত, আর একারণে বিদেশী আধিপত্যের অধীনে পড়ে। যেখানে ইতালী ছিল অস্ট্রিয়ার সম্রাটের অধীন, জার্মানী এমন জোয়ালের অধীন যা সর্বরুশীয় জারের অধীনের চেয়ে কম নয় যদিও অধিক পরোক্ষ। ১৮ মার্চ ১৮৪৮ এর ফলাফল উভয়ত ইতালী ও জার্মানীকে অপমানের হাত থেকে মুক্ত করে; যদি ১৮৪৮ থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত দুই বিরাট জাতি পুনর্গঠিত হয় আর যেকোনভাবেই হোক নিজের পায়ে দাঁড়ায়, সেটা ছিল যেমনটা কার্ল মার্কস বলে থাকেন, যে লোকেরা ১৮৪৮ এর বিপ্লবকে দমন করে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারাই ছিল এর দায়ভাগী ব্যাবস্থাপক *[টিকাঃ তাঁর অনেক লেখায় বিশেষত "১৮৫৯ সালের মধ্যে" মার্কস এই মত প্রকাশ করেন যে ১৮৪৮ সাল বিপ্লবের কর্মকান্ডের স্বাক্ষ্য বহন করে আর অনিবার্যভাবে বিপ্লবের দাবিদাওয়া পূরণ করে, যদিও করুণ পরিহাসরূপে]*।

সর্বত্রই এই বিপ্লব ছিল শ্রমিকশ্রেণীর কাজ; সেই ব্যারিকেড তৈরি করে আর রক্তঘাম দিয়ে এটা গড়ে তোলে। সরকার উৎখাতে কেবল প্যারিসীয় শ্রমিকদেরই সুনির্দিষ্ট আকাঙ্খা ছিল বুর্শোয়া শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদ করার। কিন্তু যদিও তাদের নিজ শ্রেণী ও বুর্শোয়াদের মধ্যকার বিদ্যমান বিপজ্জনক বৈরিতা সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল, তখনো দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অথবা ব্যাপক ফরাসী শ্রমিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এমন মাত্রায় পৌঁছেনি যাতে একটা সামাজিক পুনর্গঠন সম্ভব হয়। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাই, বিপ্লবের ফলগুলি পুঁজিপতি শ্রেণী আহরণ করে। অন্য দেশে যথা ইতালী, জার্মানী, অস্ট্রিয়াতে শ্রমিকরা একেবারে প্রথম থেকেই বুর্শোয়াদেরকে ক্ষমতায় বসানো ছাড়া আর কিছু করেনি। কিন্তু কোন দেশেই জাতীয়

স্বাধীনতা ব্যতীত বুর্শোয়াদের শাসন সম্ভব নয়। তাই ১৮৪৮ এর বিপ্লবকে জাতিসমূহের ঐক্য ও স্বশাসন এনে দিতে হয় সেই সব দেশের জন্য যাদের তখন পর্যন্ত তা ছিলনা যথা ইতালী, জার্মানী ও হাঙ্গেরি। তারপর আসবে পোল্যান্ডের পালা।

তাই, ১৮৪৮ সালের বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক না হলেও সেই পথে নিয়ে যায় আর তার মাটি প্রস্তুত করে। সকল দেশের বৃহদায়তন শিল্পের উপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে বুর্শোয়া শাসনব্যবস্থা এক জনবহুল, পুঞ্জীভূত আর শক্তিশালী সর্বহারা শ্রেণী সৃষ্টি করে। ইশতেহারের ভাষায় বললে, সে জন্ম দিয়েছে তার কবর খোদাইকারীদের। প্রত্যেক দেশের স্বশাসন আর ঐক্য পুনরুদ্ধার না করে, সর্বহারা শ্রেণীর আন্তর্জাতিক মিলন অর্জন অসম্ভব হবে, অথবা অসম্ভব হবে সাধারণ লক্ষ্যের দিকে এইসব জাতির শান্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিমান সহযোগিতা। একবার কল্পনা করুন ১৮৪৮ এর পূর্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অধীনে ইতালীয়, হাঙ্গেরীয়, জার্মান, পোলীয় ও রুশী শ্রমিকদের যৌথ আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড যদি থাকত!

তাই ১৮৪৮ সালের লড়াইগুলো বৃথা লড়া হয়নি। আমাদেরকে বিপ্লবী যুগ থেকে বিচ্ছিন্নকারী পঁয়তাল্লিশ বছরও অযথা অতিক্রান্ত হয়নি। ফলগুলো পেঁকে উঠছে, আর আমার ইচ্ছা হয় যে ইতালীয় অনুবাদের এই সংস্করণ ইতালীয় সর্বহারা শ্রেণীর বিজয়বার্তা নিয়ে আসুক যেমনটা মূল প্রকাশনা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের জন্য করেছে। অতীতে পুঁজিবাদ যে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে তার প্রতি *ইশতেহার* পূর্ণ সুবিচার করেছে। প্রথম পুঁজিবাদী দেশ ছিল ইতালী। সামন্তবাদী মধ্যযুগের অবসান আর আধুনিক পুঁজিবাদী যুগের সূচনা এক মহান ব্যক্তির দ্বারা চিহ্নিত হয়ঃ একজন ইতালীয় দান্তে, যিনি উভয়ত মধ্য যুগের শেষ আর আধুনিক কালের প্রথম কবি। ১৩০০ সালের মতই আজকেও এক নতুন ঐতিহাসিক যুগ এগিয়ে আসছে। ইতালী কি আমাদের এক নতুন দান্তে দেবে যিনি এই নতুন সর্বহারা যুগের জন্মলগ্নকে চিহ্নিত করবেন?

ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস

লন্ডন

১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

সাম্যবাদী পার্টির ইশতেহার

মার্কস এঙ্গেলস

ভুমিকা

ইউরোপ যেন এক ভুত দেখছে — সাম্যবাদের ভুত। পুরোনো ইউরোপের সকল শক্তিঃ পোপ ও জার, মেত্তেরনিখ ও গিজো, ফরাসী র‍্যাডিকেল আর জার্মান পুলিশগোয়েন্দারা মিলে এক পবিত্র জোট গঠন করছে এই আতঙ্ককে ঝেড়ে ফেলতে।

এমন কোন বিরোধী পার্টি কি আছে যাকে তার ক্ষমতাসীন প্রতিপক্ষ সাম্যবাদী ধরণের বলে গালি দেয়নি? আর এমন কোন বিরোধীই বা কোথায় যে তার চেয়ে অধিক অগ্রসর পার্টি ও সেইসাথে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিপক্ষদের সাম্যবাদী আখ্যা দেওয়া গালি ফিরিয়ে দেয়নি?

এ থেকে দুটি জিনিস বেরিয়ে আসেঃ

১। ইউরোপীয় শক্তিসমুহ সাম্যবাদকে একটা শক্তি হিসেবে ইতিমধ্যেই স্বীকার করে নিয়েছে।

২। এখনই উপযুক্ত সময় সাম্যবাদীদের পুরো বিশ্বের সামনে নিজেদের মত, লক্ষ্য, প্রবণতা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করার, আর সাম্যবাদের আষাঢ়ে গল্পের জবাব দিতে হবে নিজেদের পার্টির এক ইশতেহার দিয়ে।

এই লক্ষ্যে নানা জাতির সাম্যবাদীরা লন্ডনে মিলিত হয়েছেন আর নিম্নলিখিত ইশতেহার রচনা করেছেন যা ইরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, ফ্লেমিশ ও ডেনিশ ভাষায় প্রকাশিত হবে।

১ম অধ্যায়

বুর্শোয়া ও সর্বহারা

[১৯৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকাঃ বুর্শোয়া বলতে আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণী বোঝায়, যারা সামাজিক উৎপাদনের উপায়ের মালিক আর মজুরি-শ্রমের নিয়োগ কর্তা। সর্বহারা বলতে আধুনিক মজুরি শ্রমিকদের বোঝায়, যাদের নিজেদের কোন উৎপাদনের উপায় না থাকায় বেঁচে থাকার জন্য শ্রমশক্তি বেচতে বাধ্য হয়]

আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখে গেছে তার ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস *[১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণ ও ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকাঃ অর্থাৎ সকল লিখিত ইতিহাস। ১৮৪৭ সালে সমাজের প্রাগিতিহাস, লিখিত ইতিহাসের পূর্ববর্তী কালের অস্তিত্বশীল সামাজিক সংগঠন একেবারেই অজানা ছিল। তারপর আগস্ট ভন হ্যাক্সথহাউজেন (১৭৯২-১৮৬৬) রাশিয়ায় ভূমির সাধারণ মালিকানা আবিষ্কার করেন। জর্জ ল্যুডভিগ ভন মুরের প্রমাণ করেন যে সকল টেটোনিক জাতির ইতিহাস এই সামাজিক ভিত্তি থেকেই যাত্রা করেছে, আর ক্রমে ক্রমে দেখা গেছে আয়ারল্যান্ড থেকে ভারত পৃথিবীর সর্বত্রই গ্রাম গোষ্ঠীই সমাজের আদি রূপ ছিল বা রয়েছে। লুইস হেনরী মর্গান (১৮১৮-১৮৬১)-এর চূড়ান্ত আবিষ্কার গোত্র ও উপজাতির সাথে তার সম্পর্ক আদিম সাম্যবাদী সমাজের আভ্যন্তরীণ সংগঠনের কাঠামোগত রূপ খোলাসা করে দিয়েছে। আদিম গোষ্ঠীগুলি ভেঙে যাওয়ার মাধ্যমে সমাজ ভিন্ন ভিন্ন ও শেষ পর্যন্ত বৈর শ্রেণীতে ভেঙে গেল। 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উদ্ভব' গ্রন্থটিতে আমি এই ভাঙনকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি, ২য় সংস্করণ, স্তুতগার্ত ১৮৮৬]*।

স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান (প্রাচীন রোমের অভিজাত মানুষ) ও প্লিবিয়ান (প্রাচীন রোমের সাধারণ মানুষ), জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ড কর্তা (গিল্ড হল্ল মধ্যযুগের শিল্পসংঘ) *[১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকাঃ গিল্ড কর্তা হচ্ছে গিল্ড সংঘের পূর্ণ সদস্য, এর আভ্যন্তরীণ কর্তা, তার প্রভু নয়]* ও কারিগর, এককথায় নিপীড়ক ও নিপীড়িতরা অব্যাহতভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, বিরতিহীনভাবে লড়াই চালিয়েছে কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে, যে লড়াই প্রতিবারই শেষ হয়েছে সমগ্র সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠণে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলির সাধারণ ধ্বংসে।

ইতিহাসের আগেকার যুগসমূহে আমরা প্রায় সর্বত্রই দেখি সমাজের নানা বর্গের জটিল বিন্যাস, সামাজিক পদ মর্যাদার বহুবিধ স্তর। প্রাচীন রোমে আমরা পাই প্যাট্রিশিয়ান, যোদ্ধা, প্লিবিয়ান, দাস; মধ্যযুগে সামন্ত প্রভু, জায়গিরদার, গিল্ড কর্তা, কারিগর, শিক্ষানবীশ কারিগর, ভূমিদাস প্রভৃতি; এসব প্রায় প্রতিটা শ্রেণীর মধ্যে আবার রয়েছে অধীন উপস্তরসমূহ।

সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে বুর্শোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে তা শ্রেণী বৈরিতার অবসান ঘটায়নি। বরং তা প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণীসমূহ, অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরোনোটার জায়গায় সংগ্রামের নতুন ধরন।

আমাদের যুগ, বুর্শোয়া যুগের রয়েছে এই এক বিশিষ্টতাঃ এটা শ্রেণী বৈরিতাকে সরল করেছে। সমাজ বেশি বেশি করে দুই শত্রু ভাবাপন্ন শিবিরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, মুখোমুখি দাঁড়ানো দুই বিরাট শ্রেণীঃ বুর্শোয়া ও সর্বহারা।

মধ্যযুগের ভূমিদাসদের থেকে প্রথমদিককার শহরগুলির স্বাধীন নাগরিকদের উদ্ভব ঘটে। এদের থেকেই বুর্শোয়াদের প্রথম উপাদান গড়ে উঠে।

আমেরিকা আবিষ্কার ও আফ্রিকা প্রদক্ষিণ উদীয়মান বুর্শোয়াদের সামনে নতুন দরজা খুলে দিল। পূর্বভারত ও চীনের বাজার, আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন, উপনিবেশগুলির সাথে বাণিজ্য আর বিনিময় ব্যবস্থা তথা সাধারণভাবে পণ্যের প্রসার বাণিজ্য, নৌযাত্রায় ও শিল্পে অভূতপূর্ব গতি সৃষ্টি করল, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের ভেতরকার বিপ্লবী উপাদানের জন্য এনে দিল দ্রুত বিকাশ।

সামন্ত শিল্প ব্যবস্থায় শিল্প উৎপাদন গন্ডিবদ্ধ গিল্ডগুলির একচেটিয়া কতৃত্বে ছিল, তা আর নতুন বাজারসমূহের বর্ধিত চাহিদার জন্য পর্যাপ্ত নয়। হস্তশিল্প কারখানা তার জায়গা নিল। কারখানাজীবী মধ্যশ্রেণী গিল্ড কর্তাদের ঠেলে সরিয়ে দিল; প্রতিটি একক কারখানার মধ্যেকার শ্রম বিভাজনের সামনে বিভিন্ন সংঘবদ্ধ গিল্ডের মধ্যকার শ্রম বিভাজন মিলিয়ে গেল।

এদিকে বাজার বেড়েই চলল, চাহিদাও বেড়ে চলল। এমনকি হস্তশিল্প কারখানাও আর যথেষ্ট নয়। অতঃপর বাষ্প ও যন্ত্রপাতি শিল্প উৎপাদনের বিপ্লবীকরণ ঘটাল। হস্তশিল্পের স্থান নিল অতিকায় আধুনিক শিল্প; শিল্প মধ্যশ্রেণীর স্থান নিল শিল্প লাখপতি, যারা সমগ্র শিল্প বাহিনীর হর্তাকর্তা সেই আধুনিক বুর্শোয়া।

আধুনিক শিল্প বিশ্ববাজার প্রতিষ্ঠা করেছে আমেরিকা আবিষ্কার যার পথ দেখিয়েছে। এই বাজার বানিজ্য, নৌযাত্রা ও স্থলপথে যোগাযোগের বিপুল বিকাশ ঘটিয়েছে। এই বিকাশ আবার শিল্পের প্রসারকে প্রভাবিত করে; যে অনুপাতে শিল্প, বাণিজ্য, নৌযাত্রা ও রেলপথ সম্প্রসারিত হল সেই একই অনুপাতে বুর্শোয়া বিকশিত হল, তার পুঁজি বাড়িয়ে তুলল আর মধ্যযুগ থেকে আগত সকল শ্রেণীকে পেছেনে ঠেলে দিল।

তাই আমরা দেখি কীভাবে আধুনিক বুর্শোয়া নিজেই এক দীর্ঘ বিকাশ ধারার ফল, উৎপাদন পদ্ধতি ও বিনিময়ের এক ধারাবাহিক বিপ্লবের পরিণতি।

বুর্শোয়ার বিকাশের প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়েছে সে শ্রেণীর রাজনৈতিক বিকাশ *[টিকাঃ জার্মান মূল (১৮৪৮ সংস্করণ)-এ "সে শ্রেণীর রাজনৈতিক বিকাশ"-এর স্থলে আছে "রাজনৈতিক বিকাশ"]*। এই যে বুর্শোয়ারা যারা ছিল সামন্ত অভিজাতদের যাঁতাকলে পিষ্ট এক নিপীড়িত শ্রেণী, মধ্যযুগীয় কমিউনে দেখা দেয় এক সশস্ত্র স্বশাসিত সংঘ রূপে *[১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকাঃ ইতালী ও ফ্রান্সের শহুরে বাসিন্দারা তাদের নগর-সমাজের এই নাম (কমিউন) দিয়েছিল তাদের সামন্তপ্রভুদের কাছ থেকে আত্মশাসনের প্রাথমিক অধিকার ক্রয় অথবা জয় করার পর]*, কোথাও স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র (যেমন ইতালী ও জার্মানীতে) *[টিকাঃ জার্মান মূল সংস্করণে "(যেমন ইতালী ও জার্মানী)" নেই]*, কোথাও রাজতন্ত্রের করদাতা "তৃতীয় মণ্ডলী" রূপে (যেমন ফ্রান্সে) *[টিকাঃ (যেমন ফ্রান্সে) কথাটি মূল জার্মানে নেই]*, অতঃপর যাদেরকে হস্তশিল্প কারখানা পদ্ধতির প্রকৃত যুগে অভিজাতদের বিরুদ্ধে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয় আধা-সামন্ততন্ত্র নাহয় নিরংকুশ রাজতন্ত্রকে সেবা করে, বস্তুত, যারা ছিল বিরাট রাজতান্ত্রিক শক্তিগুলোর স্তম্ভস্বরূপ সেই বুর্শোয়ারা অবশেষে শিল্প ও বিশ্ববাজারের প্রতিষ্ঠা হতে শুরু করে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের জন্য পরিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব জয় করেছে। আধুনিক রাষ্ট্রের নির্বাহীরা সমগ্র বুর্শোয়া শ্রেণীর সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনার এক কমিটি মাত্র।

বুর্শোয়ারা ঐতিহাসিকভাবে খুবই বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে।

বুর্শোয়ারা যেখানেই সুযোগ পেয়েছে সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও শোভন সম্পর্কের অবসান ঘটিয়েছে। যে বিচিত্র সামন্ততান্ত্রিক বাঁধনে মানুষ এতকাল বাঁধা ছিল তাদের স্বভাবসুলভ উর্ধতনদের সাথে, বুর্শোয়া তা ছিড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে, আর মানুষে মানুষে নগ্ন স্বার্থ ছাড়া, নির্দয় "নগদ টাকা"র সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক বাকি রাখেনি। আত্মসর্বস্ব পৃ৩৪

হিসাবনিকাশের বরফজলে ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্ম উন্মাদনার স্বর্গীয় মোহ, বীরত্ববাদী উদ্দীপনা আর সংকীর্ণ ভাবালুতা। এরা ব্যক্তিগত মূল্যকে বিনিময় মূল্যে পরিণত করেছে, অজস্র খণ্ড খণ্ড অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থলে খাড়া করল এই একটিমাত্র অনৈতিক স্বাধীনতা – অবাধ বাণিজ্য। এক কথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভ্রমের পর্দার নিচে ঢাকা শোষণের স্থলে এরা নিয়ে এসেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, প্রত্যক্ষ, পাশবিক শোষণ।

মানুষের যেসব পেশাকে এতদিন সম্মান করা হত আর বিনম্র শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত বুর্শোয়ারা তার মহিমা ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসক, আইনজীবি, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানীকে সে তার মজুরি খাটা শ্রমিকে পরিণত করেছে।

বুর্শোয়ারা পরিবারের ভাবালু পর্দাকে ছিঁড়ে ফেলেছে আর পারিবারিক সম্পর্ককে স্রেফ আর্থিক সম্পর্কে পরিণত করেছে।

মধ্যযুগের শক্তির পাশবিক প্রদর্শনী যাকে প্রতিক্রিয়াশীলরা এতটা প্রশংসা করে, তার সাথে চূড়ান্ত অলস ভোগ বিলাস কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্নভাবে বিরাজিত ছিল তা বুর্শোয়া শ্রেণী ফাঁস করে দেয়। তারাই প্রথম দেখায় মানুষের কার্যকলাপ কী সৃষ্টি করতে পারে। এদের আশ্চর্য কীর্তি মিশরীয় পিরামিড, রোমান কৃত্রিম নালা, গথিক গির্জাকেও বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। এরা এমন অভিযান চালিয়েছে যা অতীতের সকল জাতির দেশান্তর যাত্রা ও ধর্মযুদ্ধকেও ম্লান করে দিয়েছে।

উৎপাদনের উপকরণ, ফলত উৎপাদন সম্পর্ক ও সেইসাথে সমাজের সকল সম্পর্কের বিপ্লবীকরণ না করে বুর্শোয়ারা অস্তিত্বশীল থাকতে পারেনা। বিপরীতে পূর্বতন সকল শিল্পশ্রেণীসমূহের অস্তিত্বের প্রথম শর্ত ছিল পুরনো উৎপাদন পদ্ধতি অপরিবর্তিতরূপে বজায় রাখা। উৎপাদনের অব্যাহত বিপ্লবীকরণ, সকল সামাজিক পরিস্থিতির স্থায়ী নৈরাজ্য, চির অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা বুর্শোয়া যুগকে আগের সকল যুগ থেকে পৃথক করে *[টিকাঃ ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে "আগের"-এর স্থলে আছে "অন্য"]*। সকল স্থির অনড় সম্পর্ককে তাদের প্রাচীন শ্রদ্ধাভাজন অহংকার ও মতামতসমেত ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হয়, সকল নতুন ধরণসমূহ স্থায়িত্ব পাওয়ার আগেই মিলিয়ে যায়, যাকিছু ভারিক্কী তাই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায়, যা পবিত্র তা হয় কলুষিত, মানুষ শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয় তার জীবনের আসল অবস্থা ও অন্যের সাথে তার সম্পর্ককে খোলা চোখে দেখতে।

নিজ উৎপন্নের জন্য অবিরত বর্ধমান এক বাজারের প্রয়োজন বুর্শোয়াদের সমগ্র দুনিয়াব্যাপী দৌঁড় করিয়ে বেড়ায়। তাকে সর্বত্র বাসা বাঁধতে হয়, সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হতে হয়, সর্বত্র যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়।

বিশ্ববাজারকে শুষে নিয়ে বুর্শোয়ারা প্রতিটি দেশের উৎপাদন ও ভোগের এক আন্তর্জাতিক চরিত্র প্রদান করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের হতভম্ব করে দিয়ে তারা শিল্পের পায়ের তলা থেকে এর জাতীয় ভিত্তিটাই কেড়ে নিয়েছে। সকল সাবেকী জাতীয় শিল্প ধ্বংস হয়েছে অথবা প্রতিদিনই ধ্বংস হচ্ছে। তাদের জায়গা নিচ্ছে নতুন শিল্প যার প্রচলন হয়ে দাঁড়িয়েছে সকল সভ্য জাতির জীবন মরণ প্রশ্ন, যে শিল্প স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে চলেনা বরং দূরতম এলাকা থেকে আহরিত কাঁচামাল দিয়ে চলে। সেসব শিল্পের উৎপন্ন ভোগ হয় শুধু দেশে নয় বরং বিশ্বের সকল অঞ্চলে। দেশের উৎপাদন দিয়ে মেটানো হত যে পুরোনো চাহিদা তার স্থলে আসে নতুন চাহিদা যা মেটানোর জন্য দেশবিদেশের দূরবর্তী স্থান ও আবহাওয়া থেকে আনা হয় উৎপন্ন। পুরোনো স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও আত্মনির্ভরশীলতার জায়গায় মিলন ঘটে সর্বত্র, বিশ্বজুড়ে গড়ে উঠে জাতিসমূহের পারস্পরিক নির্ভরতা। বস্তুসামগ্রী উৎপাদনে যেমন, তেমনই বুদ্ধিবৃত্তিক উৎপাদনেও। প্রতিটি স্বতন্ত্র জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক সৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ সম্পদ। জাতীয় একপেশেমি ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তি অধিক থেকে অধিক অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, আর অসংখ্য জাতীয় ও স্থানীয় সাহিত্য থেকে জেগে উঠে এক একটা বিশ্বসাহিত্য।

বুর্শোয়ারা উৎপাদনের সকল উপকরণের দ্রুত উন্নতি মারফত, যোগাযোগ ব্যবস্থার অতি সুবিধার মাধ্যমে সকল জাতিকে এমনকি বর্বরতমদেরও সভ্যতায় টেনে আনছে। পণ্যের সস্তা দর হচ্ছে সেই গোলা যা সকল চীনের প্রাচীর গুড়িয়ে দেয়, যার দ্বারা সে বর্বরদের অতি একগুয়ে বিজাতি-বিদ্বেষকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। সে সকল জাতিকে বাধ্য করে বিলোপের হাত থেকে বাঁচতে বুর্শোয়া উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণে। তারা যাকে সভ্যতা বলে সেই জিনিসটা তাদের মধ্যে ঢুকাতে বাধ্য করে, তাদেরকে বুর্শোয়া হতে বাধ্য করে। এককথায়, বুর্শোয়া শ্রেণী পৃথিবীকে তার নিজের চেহারায় তৈরি করে।

বুর্শোয়ারা গ্রামাঞ্চলকে শহরাঞ্চলের অধীন করেছে। সে বিরাটাকার শহরগুলো তৈরি করেছে, গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িয়েছে, এভাবে জনগণের এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশকে গ্রাম্য জীবনের মূর্খতা থেকে বাঁচিয়েছে। সে যেমন গ্রামকে শহরের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে, একইভাবে নির্ভরশীল করে তুলেছে বর্বর ও অর্ধ বর্বর দেশগুলিকে সভ্য

দেশগুলোর উপর, কৃষক-প্রধান জাতিগুলিকে বুর্শোয়া-প্রধান জাতিগুলির উপর আর প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের উপর।

বুর্শোয়া শ্রেণী জনসংখ্যা, উৎপাদনের উপায় ও সম্পত্তির ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্রমে ক্রমে অবসান করে জনসংখ্যা পুঞ্জীভূত করে, উৎপাদনের উপায়কে করে কেন্দ্রীভূত আর সম্পত্তি নিয়ে আসে মুস্টিমেয়র হাতে। এর আবশ্যিক ফল হল রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন। স্বাধীন অথবা শিথিলভাবে যুক্ত প্রদেশসমূহ যাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বার্থ, আইন, সরকার ও কর ব্যবস্থা রয়েছে তাদের একটি একক জাতিতে ঠেসে মেলানো হয় যার রয়েছে একক সরকার, একক আইন সংহিতা, একই জাতীয় শ্রেণীস্বার্থ, একই সীমান্ত ও একই শুল্ক ব্যবস্থা।

বুর্শোয়ারা তাদের শাসনের এই এক শতাব্দীতে এমন বিরাটাকার বিশাল উৎপাদিকা শক্তি সৃষ্টি করেছে যা অতীতের সকল প্রজন্ম মিলেও করতে পারেনি। প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের অধীন করা, যন্ত্রপাতি, শিল্প ও কৃষিতে রসায়নবিদ্যার প্রয়োগ, বাষ্পশক্তির সাহায্যে নৌযাত্রা, রেলওয়ে, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ, আবাদের জন্য গোটা এক একটা মহাদেশ সাফ করে ফেলা, নদীর খাল খনন, একেকটা জনসমষ্টি যেন যাদুমন্ত্রের মত মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল, সামাজিক শ্রমের মধ্যে এতটা উৎপাদিকা শক্তি লুক্কায়িত ছিল যে তা ছিল পূর্বতন শতাব্দীর ধারণার বাইরে।

তাহলে আমরা দেখছিঃ উৎপাদনের উপায় ও বিনিময় যার ওপর বুর্শোয়ারা নিজেদের গড়ে তুলেছে, তা সামন্ত সমাজের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। এসব উৎপাদনের উপায় ও বিনিময়ের বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে, যে শর্তের অধীনে সামন্ত সমাজ উৎপাদন ও বিনিময় করত, কৃষি ও হস্তশিল্পের সামন্তীয় সংগঠন, এক কথায় সামন্ত মালিকানা সম্পর্ক ইতিমধ্যেই বিকশিত উৎপাদিকা শক্তির সাথে খাপ খেলনা *[টীকাঃ মূল জার্মান সংস্করণে বাক্যটি এখানে শেষ হয়েছে। তারপর রয়েছেঃ "তারা উৎপাদনকে বিকশিত না করে বাঁধাগ্রস্থ করল। তারা বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়াল..."]*, তারা বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। তাদেরকে ভেঙে ফেলতে হত; তাদের ভেঙে ফেলা হল।

তার জায়গায় এল অবাধ প্রতিযোগিতা, সেই সাথে এল তারই উপযোগী সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিবিধান আর বুর্শোয়াদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব।

আমাদের চোখের সামনে চলছে একই ধরণের আর একটি ধারা, আধুনিক বুর্শোয়া সমাজ তার উৎপাদন সম্পর্ক, বিনিময় সম্পর্ক ও সম্পত্তি সম্পর্ক সহকারে এত ব্যাপক বিশাল উৎপাদনের উপায় ও বিনিময় গড়ে তুলেছে এটা যেন সেই রূপকথার জাদুকর তার জাদুমন্ত্র

বলে পাতালপুরির শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তুলেছে যা আর সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেনা। বিগত বহু দশক ধরে শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস হচ্ছে শুধু আধুনিক উৎপাদন সম্পর্কের বিরুদ্ধে, বুর্শোয়া ও তার শাসনের অস্তিত্বের শর্ত যে মালিকানা সম্পর্ক তার বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদিকা শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস। পালা করে আবির্ভূত হয়ে যে বাণিজ্য সংকট সমগ্র বুর্শোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই বিপন্ন করে তোলে অধিক থেকে অধিকতরভাবে তার উল্লেখই যথেষ্ট। এই সংকটের ফলে বিদ্যমান উৎপাদিত সামগ্রীর বিরাট অংশই শুধু নয়, আগে সৃষ্ট উৎপাদিকা শক্তিও পর্যায়ক্রমে ধ্বংস হয়। এই সংকটে এক মহামারীর আবির্ভাব ঘটে যা অতীতের সকল যুগে অসম্ভব মনে হত—অতি উৎপাদনের মহামারী। সমাজ হঠাৎ এক সাময়িক বর্বর অবস্থায় ফিরে যায় যেন এ এক দুর্ভিক্ষ, এক ধ্বংসযজ্ঞের বৈশ্বিক যুদ্ধ সকল জীবনযাত্রার উপায়ের সরবরাহ কেটে দিয়েছে, শিল্প ও বাণিজ্য মনে হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত, কিন্তু কেন? কারণ সভ্যতা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেছে, মাত্রাতিরিক্ত জীবন ধারণের সামগ্রী, মাত্রাতিরিক্ত শিল্প, মাত্রাতিরিক্ত বানিজ্য। সমাজের হাতে যে উৎপাদিকা শক্তি রয়েছে তা বুর্শোয়া সম্পত্তি মালিকানার পরিস্থিতির বিকাশে আর সাহায্য করছেনা *[টীকাঃ ১৮৪৮ সালের জার্মান সংস্করণে "বুর্শোয়া সম্পত্তি মালিকানার পরিস্থিতির বিকাশ" এর জায়গায় আছে "বুর্শোয়া সভ্যতা ও বুর্শোয়া সম্পত্তি মালিকানার পরিস্থিতির বিকাশ"। কিন্তু ১৮৭২, ১৮৮৩ ও ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে "বুর্শোয়া সভ্যতা ও" কথাটি কেঁটে দেয়া হয়]* বরং তা এই পরিস্থিতির জন্য মাত্রাতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে গেছে, এই পরিস্থিতি তার জন্য শৃংখল হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর এই শৃংখল ভেঙা ফেলা মাত্র তা সমগ্র বুর্শোয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে, বুর্শোয়া সম্পত্তি মালিকানার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। বুর্শোয়া সমাজের পরিস্থিতি তার দ্বারা সৃষ্ট সম্পদকে ধরে রাখার জন্য বড়ই সংকীর্ণ। আর কীভাবেই বা বুর্শোয়া এই সংকট থেকে মুক্তি পাবে? একদিকে উৎপাদিকা শক্তির বিরাট অংশ বাধ্য হয়ে ধ্বংস করে ফেলে; অন্যদিকে নতুন বাজার খুঁজে বের করে আর পুরোনো বাজারকে আরো বেশি বেশি শোষণ করে। এর অর্থ হল আরো বেশি মাত্রায় ও অধিক ধ্বংসাত্মক সংকটের পথে এগিয়ে গিয়ে, আর খোদ সংকট দূর করার উপায়ই কমিয়ে ফেলে।

যে অস্ত্রে বুর্শোয়ারা সামন্তবাদকে ধূলিসাৎ করেছে তা এখন তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই উদ্যত।

যে অস্ত্রে নিজেদের মৃত্যু বুর্শোয়া শ্রেণী সেই অস্ত্রই শুধু গড়েনি, তারা এমন লোকও তৈরি করেছে যারা সেই অস্ত্র ধারণ করবে—আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী—সর্বহারা।

যে অনুপাতে বুর্শোয়া অর্থাৎ পুঁজি বিকশিত হয়, সেই একই অনুপাতে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী সর্বহারাও বিকশিত হয়—শ্রমজীবিদের একটি শ্রেণী যারা ততদিন বেঁচে থাকে যতদিন তারা কাজ পায়, আর ততদিন তারা কাজ পায় যতদিন তাদের শ্রম পুঁজিকে বাড়িয়ে তোলে। এই শ্রমিকেরা যারা নিজেদের টুকরো টুকরো করে বেঁচতে বাধ্য হয় বাণিজ্যের অন্য সামগ্রীর মতই তারা হচ্ছে পণ্য, ফলত প্রতিযোগিতার সকল ওলট পালট আর বাজারের সকল উঠানামার অধীন।

যন্ত্রের বহুল ব্যবহার আর শ্রম বিভাগের কারণে সর্বহারা শ্রেণীর কাজ তার সকল ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। আর তাই কর্মী হারিয়েছে কাজের প্রতি আকর্ষণ। সে হয়ে দাঁড়িয়েছে যন্ত্রের লেজুড়, তার কাছে চাওয়া হয় অতি সরল, একান্ত একঘেয়ে আর অতি সহজে অর্জনীয় যোগ্যতাটুকু। তাই একজন শ্রমিকের উৎপাদন খরচ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে প্রায় একান্তই তার বেঁচে থাকার আর বংশ রক্ষার জন্য যতটুকু অন্নবস্ত্রের সংস্থান দরকার ততটুকু পর্যন্তই। কিন্তু পণ্যের দাম, অতএব শ্রমের দামও *[টীকাঃ মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের পরবর্তীকালের রচনাসমূহে "শ্রমের মূল্য"-এর জায়গায় "শ্রমশক্তির মূল্য" এবং "শ্রমের দাম"-এর জায়গায় "শ্রমশক্তির দাম" (প্রথম মার্কস কর্তৃক উত্থাপিত)-এর অধিকতর সঠিক ধারণা প্রতিস্থাপন করেন]* উৎপাদন খরচের সমান। তাই, যে অনুপাতে কাজের জঘণ্যতা বাড়ে, সেই অনুপাতে মজুরি কমে। শুধু তাই নয়, যন্ত্রের ব্যবহার ও শ্রম বিভাগ যে অনুপাতে বাড়ে, সেই অনুপাতে শ্রমভারও বৃদ্ধি পায় শ্রমঘন্টা বাড়ানো, একটা নির্দিষ্ট সময়ে বেশি কাজ আদায় করে অথবা যন্ত্রের গতি বাড়িয়ে প্রভৃতি।

আধুনিক শিল্প পিতৃতান্ত্রিক মালিকের ছোট কর্মশালাকে শিল্প পুঁজিপতির অতিকায় কারখানায় পরিণত করেছে। কারখানায় বিপুল শ্রমিক জনগণকে ঢোকানো হয় ভিড় করে, সৈন্যবাহিনীর মত সাজানো হয়। শিল্পবাহিনীর সৈন্যদল হিসেবে তাদেরকে অফিসার ও সার্জেন্টদের উচ্চপদস্থদের কমান্ডের অধীন একটি খাঁটি বহুধাপী ব্যবস্থায় সাজানো হয়। তারা বুর্শোয়া শ্রেণী ও বুর্শোয়া রাষ্ট্রের দাসই শুধু নয়, তারা প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় যন্ত্রের দাসে, পরিদর্শকের দাসে আর সর্বোপরি স্বতন্ত্র বুর্শোয়া মালিকের দাসে পরিণত হয়। যত খোলামেলাভাবে এই স্বেচ্ছাচার মুনাফাকে তার লক্ষ্য ও আদর্শ বলে ঘোষণা করে ততই তা আরো হীন, আরো ঘৃণ্য ও আরো তিক্ত হয়ে উঠে।

দৈহিক শ্রমে যত কম দক্ষতা ও শক্তি যত কম লাগতে থাকে, অন্য কথায় আধুনিক শিল্প যত বেশি বিকাশ লাভ করে, ততই পুরুষদের জায়গায় নারীদের শ্রম স্থলাভিষিক্ত হয়*[টীকাঃ*

ফেব্রুয়ারী ১৮৪৮-এর জার্মান সংস্করণে "নারীদের শ্রম স্থলাভিষিক্ত হয়" এর স্থলে আছে "নারী ও শিশুদের শ্রম স্থলাভিষিক্ত হয়"]। শ্রমিক শ্রেণীর জন্য বয়স বা লিঙ্গের পার্থক্যের আর কোন সামাজিক যোগ্যতা থাকেনা। সকলেই শ্রমের যন্ত্র, বয়স ও লিঙ্গ অনুসারে সে যন্ত্র ব্যবহারের খরচটুকু কিছু বাড়ে-কমে মাত্র।

শ্রমিকের ওপর কারখানা মালিকের শোষণ খানিকটা শেষ হতেই, তার মজুরি হাতে আসা মাত্রই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বুর্শোয়াদের অন্যান্য অংশঃ বাড়িঅলা, দোকানদার, মহাজন প্রভৃতি।

মধ্যশ্রেণীর নিমস্তর—ক্ষুদে ব্যবসায়ী, দোকানদার, সাধারণত আগেকার কারবারীরা সবাই, হস্তশিল্পী ও কৃষক—এরা সবাই ক্রমে ক্রমে সর্বহারা শ্রেণীতে নেমে আসে, কারণ তাদের সামান্য পুঁজি আধুনিক শিল্প চালাবার মত যথেষ্ট বড় নয়, আর এখন প্রতিযোগিতায় বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাদের গিলে ফেলে, অংশত এই জন্য যে উৎপাদনের নয়া পদ্ধতির কাছে তাদের বিশেষ নৈপুণ্যটুকু মূল্যহীন প্রতিভাত হয়। এভাবে জনগণের প্রতিটি শ্রেণী থেকে আগত লোকের দ্বারা সর্বহারা শ্রেণীর পুষ্টিলাভ হতে থাকে।

সর্বহারা শ্রেণী বিকাশের নানা স্তরের মধ্য দিয়ে যায়। জন্মের সাথে সাথে বুর্শোয়ার সাথে তার সংগ্রাম শুরু হয়। প্রথমে স্বতন্ত্র ব্যক্তি শ্রমিকের সাথে লড়াই বাঁধে, তারপর একটা গোটা কারখানার শ্রমজীবিদের সাথে, তারপর একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একটা পেশার সকল কর্মীদের সাথে লড়াই বাঁধে তাদের প্রত্যক্ষভাবে শোষণকারী ব্যক্তি বুর্শোয়ার সাথে। তারা তাদের সংগ্রাম চালায় উৎপাদনের বুর্শোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, বরং উৎপাদনের উপকরণের বিরুদ্ধে, তারা সেই আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রী ধ্বংস করে যা তাদের শ্রমের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত, তারা যন্ত্রপাতি ভেঙে চূর্ণ করে, কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেয়, মধ্যযুগের শিল্পকর্মীর হারানো গৌরব সে বলপ্রয়োগে ফিরিয়ে আনতে চায়।

এই পর্যায়ে শ্রমিকেরা দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ছত্রভঙ্গ অসংলগ্ন জনগণ। যদিবা কোথাও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে অধিকতর সুদৃঢ় সঙ্ঘ গড়ে তোলে তা তাদের নিজেদের সক্রিয় সম্মিলনের ফল নয় বরং বুর্শোয়াদের একতাবদ্ধতার ফল, যে শ্রেণী নিজ রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সমগ্র সর্বহারা শ্রেণীকে গতিশীল করতে বাধ্য হয়, তখনো তারা কিছু দিনের জন্য সে চেষ্টায় সফলও হয়। এই স্তরে তাই সর্বহারারা নিজেদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েনা বরং শত্রুর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে, অর্থাৎ নিরংকুশ রাজতন্ত্রের অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে, জমিদার, শিল্প বহির্ভূত বুর্শোয়া, ক্ষুদে বুর্শোয়াদের বিরুদ্ধে। এভাবে ইতিহাসের

সমস্ত গতিটি বুর্শোয়াদের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, এভাবে অর্জিত প্রতিটি জয় হল বুর্শোয়ার জয়।

কিন্তু শিল্পের বিকাশের সাথে সর্বহারা শ্রেণী সংখ্যায়ই শুধু বাড়েনা, ব্যাপক সংখ্যায় কেন্দ্রীভূত হয়, তার শক্তি বৃদ্ধি পায়, আর এই শক্তি সে বেশি বেশি অনুভব করে। যে অনুপাতে যন্ত্র শ্রমের মধ্যে পার্থক্য মুছে দিতে থাকে আর প্রায় সর্বত্র মজুরি একই নিম্ন স্তরে নামিয়ে আনে, সেই অনুপাতে অধিক থেকে অধিক সর্বহারা শ্রেণীর সারির মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ ও জীবনযাত্রার অবস্থায় সমতা আসতে থাকে। বুর্শোয়াদের মধ্যে বাড়ন্ত প্রতিযোগিতা এবং তার ফল হিসেবে যে বাণিজ্য সংকট দেখা দেয় তা শ্রমিকদের মজুরির ওঠানামা সর্বোচ্চ বাড়িয়ে তোলে। যন্ত্রের অবিরাম উন্নতি আর দ্রুততম বিকাশ তাদের জীবিকা অধিক থেকে অধিকতর অনিশ্চিত করে তোলে, ব্যক্তি শ্রমিক ও ব্যক্তি বুর্শোয়ার মধ্যে সংঘর্ষ অধিক থেকে অধিকতরভাবে দুই শ্রেণীর মধ্যে সঙ্ঘর্ষে রূপ নেয়। তখন শ্রমিকেরা মিলিত সমিতি (ট্রেড ইউনিয়ন) গঠন শুরু করে বুর্শোয়ার বিরুদ্ধে [টীকাঃ "ট্রেড ইউনিয়ন" মূল জার্মান-এ নেই]; মজুরির হার বজায় রাখার জন্য জোট বাঁধে; মাঝে মধ্যে ঘটা এই বিদ্রোহের আগে থাকতে প্রস্তুতির জন্য স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলে। এখানে ওখানে দ্বন্দ্ব পরিণত হয় দাঙ্গায়।

মাঝে মাঝে শ্রমিকরা জয়ী হয়, কিন্তু কেবল অল্পদিনের জন্য। তাদের খণ্ডযুদ্ধের সত্যিকারের লাভ তাদের আশু ফলাফলে নয় বরং শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান একতার মধ্যে নিহিত। এই ঐক্য সাহায্য পায় আধুনিক শিল্প থেকে সৃষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির দ্বারা আর তার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার শ্রমিকরা একে অপরের সংস্পর্শে আসে। একই চরিত্রের অসংখ্য স্থানীয় সংগ্রামকে দেশব্যাপী এক শ্রেণীসংগ্রামে কেন্দ্রীভূত করে করার জন্য ঠিক এই যোগাযোগটাই দরকার ছিল। কিন্তু প্রতিটি শ্রেণীসংগ্রামই হল জাতীয় সংগ্রাম। আর মধ্য যুগের নাগরিকদের তাদের সময়কার শোচনীয় রাস্তাঘাটের কারণে যে ঐক্য অর্জনে শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগেছিল তা রেলপথের কল্যাণে আধুনিক সর্বহারা শ্রেণী অর্জন করে কয়েক বছরে।

শ্রমিকদের একটি শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত হওয়া আর তার ফল হিসেবে এক রাজনৈতিক পার্টিতে সংগঠিত হওয়া শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যকার প্রতিযোগিতার দ্বারা প্রতি মুহূর্তে বাঁধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু প্রতিবারই প্রবলতর, দৃঢ়তর ও আরো শক্তিশালী হয়ে সংগঠন মাথা তোলে। এরই চাপে বুর্শোয়াদের মধ্যকার বিভক্তির সুবিধা নিয়ে তাদেরকে বাধ্য করে

শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কিছু স্বার্থের আইনগত স্বীকৃতি দিতে। এইভাবে ইংল্যান্ডে দশ ঘন্টার আইন পাশ হয়েছিল।

মোটের উপর পুরোনো সমাজের শ্রেণীসমূহের মধ্যে সংঘাত সর্বহারা শ্রেণীর বিকাশে নানাভাবে সাহায্য করে। বুর্শোয়ারা নিজেদের এক অব্যাহত যুদ্ধে দেখতে পায়ঃ প্রথমে অভিজাতদের সাথে, তারপর শিল্পের বিকাশে যাদের স্বার্থ বৈর হয়ে গেছে বুর্শোয়াদের সেসব অংশের সাথে, আর সর্বদাই বিদেশী বুর্শোয়াদের সাথে। এসকল লড়াইয়েই তাকে সর্বহারার কাছে আবেদন করতে হয়, সাহায্য চাইতে হয়, তাদেরকে টেনে আনতে হয় রাজনীতির প্রাঙ্গনে। সুতরাং বুর্শোয়ারা নিজেরাই সর্বহারাদের নিজেদের রাজনৈতিক ও সাধারণ শিক্ষার উপাদান যোগান দিতে থাকে *[টীকাঃ মূল জার্মান-এ "রাজনৈতিক ও সাধারণ শিক্ষার উপাদান" এর স্থলে আছে "শিক্ষার উপাদান"]*। অন্য কথায়, তারা সর্বহারা শ্রেণীকে বুর্শোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়ার অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করে।

আর আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে শাসকশ্রেণীর গোটা গোটা এক একটা অংশ শিল্পের বিকাশ মারফত সর্বহারার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে অথবা অন্তত অস্তিত্বের সংকটে পতিত হয়। এগুলোও সর্বহারাকে জ্ঞানালোক ও প্রগতিশীল সতেজ উপাদান সরবরাহ করে *[টীকাঃ মূল জার্মান-এ "জ্ঞানালোক ও প্রগতিশীল সতেজ উপাদান" এর স্থলে আছে "গণ শিক্ষার উপাদান"]*।

শেষত শ্রেণীসংগ্রাম যখন চূড়ান্ত মুহূর্তে আসে, শাসক শ্রেণীর মধ্যে ভাঙন ঘটতে থাকে। বস্তুত পুরোনো সমাজের পুরো কাঠামো জুড়ে এই ভাঙন ঘটে। এই ভাঙন এতটাই সহিংস ও চোখ ধাঁধাঁনো হয়ে উঠে যে শাসক শ্রেণীর এক ছোট অংশ সেই শ্রেণী ছিড়ে বেড়িয়ে এসে বিপ্লবী শ্রেণীতে যোগ দেয় যে শ্রেণীর হাতে রয়েছে ভবিষ্যত। যেমন আগেকার এক যুগে অভিজাতদের একাংশ বুর্শোয়াদের সাথে যোগ দিয়েছিল, একইভাবে এখন বুর্শোয়াদের এক খণ্ডাংশ সর্বহারাদের পক্ষে যোগ দেয়, বিশেষত বুর্শোয়া মতাদর্শীদের এক অংশ যারা নিজেদেরকে তত্ত্বগতভাবে ইতিহাসের সমগ্র গতিকে উপলব্ধির পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

বুর্শোয়াদের মুখোমুখি যেসব শ্রেণী আজকে দাঁড়িয়ে আছে, সর্বহারা শ্রেণীই তাদের মধ্যে একমাত্র প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী। অন্য শ্রেণীসমূহ আধুনিক শিল্পের সামনে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়। তাই, এই আধুনিক শিল্পেরই বিশেষ ও অপরিহার্য সৃষ্টি হল সর্বহারা।

নিম্ন মধ্যশ্রেণী, ক্ষুদে হস্তশিল্প মালিক, দোকানদার, কারিগর, কৃষক—এরা সকলেই বুর্শোয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে মধ্যশ্রেণীর অংশ হিসেবে তাদের অস্তিত্বকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। তারা তাই বিপ্লবী নয়, রক্ষণশীল। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের চাকাকে পেছনে ফেরানোর চেষ্টা করে বলে তারা প্রতিক্রিয়াশীলও। সৌভাগ্যত তারা যদি বিপ্লবীও হয় তারা তা হয় সর্বহারায় তাদের আসন্ন রূপান্তরের কারণে, তাই তারা তাদের বর্তমানের স্বার্থ নয়, ভবিষ্যতের স্বার্থ রক্ষা করে, তারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে।

পুরোনো সমাজের নিম্নতর স্তরগুলি থেকে ছিটকে পড়ে যেসব লোক নিষ্ক্রিয়ভাবে পচছে, সেই 'বিপজ্জনক শ্রেণী', সেই সামাজিক আবর্জনাটাকে *[টীকাঃ মূল জার্মান-এ "সেই 'বিপজ্জনক শ্রেণী', সেই সামাজিক আবর্জনাটা"র স্থলে আছে "ভ্রষ্ট সর্বহারা"]* এখানে সেখানে সর্বহারা বিপ্লব ঝেঁটিয়ে আন্দোলনে নিয়ে আসতে পারে; কিন্তু এর জীবনযাত্রার ধরণটা এমনই যে তা প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের ভাড়াটে হাতিয়ারের ভূমিকার জন্যই তাদের অনেক বেশি তৈরি করে তোলে।

পুরোনো সমাজের সাধারণ পরিস্থিতিটা সর্বহারা শ্রেণীর জীবনে ইতিমধ্যেই প্রায় লোপ পেতে বসেছে। সর্বহারা শ্রেণীর কোন সম্পত্তি নেই, স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে তার সম্পর্ক বুর্শোয়া পারিবারিক সম্পর্কের সাথে মেলেনা; আধুনিক শিল্পশ্রম, পুঁজির প্রতি আধুনিক অধীনতা, ইংল্যান্ডে বা ফ্রান্সে, আমেরিকাতে বা জার্মানীতে একই রকম, তার সকল জাতীয় চরিত্র হারিয়েছে। আইন, নৈতিকতা, ধর্ম হচ্ছে তার কাছে বুর্শোয়া কুসংস্কার মাত্র যার পেছনে ওঁৎ পেতে আছে বুর্শোয়া স্বার্থ।

অতীতের যে সব শ্রেণী কর্তৃত্ব পেয়েছে, তারা সবাই অর্জিত প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করতে সচেষ্ট হয়েছে গোটা সমাজের উপর তার দখলির শর্তটা চাপিয়ে দিয়ে। সেখানে সর্বহারা শ্রেণী তার ওপর চেপে থাকা পূর্বতন দখলির পদ্ধতিই শুধু নয়, দখলির প্রত্যেকটি ভূতপূর্ব পদ্ধতির অবসান না ঘটিয়ে সমাজের উৎপাদিকা শক্তির প্রভুত্ব লাভ করতে পারেনা। তাদের নিজেদের বলতে কিছু নেই যা নিরাপদ ও শক্তিশালী করতে হবে। তার লক্ষ্য হল ব্যক্তিগত মালিকানার সকল পূর্বতন নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা ধ্বংস করা।

অতীত ইতিহাসে প্রতিটি আন্দোলন ছিল সংখ্যাল্পের আন্দোলন অথবা সংখ্যাল্পের স্বার্থে আন্দোলন। সর্বহারা আন্দোলন হচ্ছে বিরাট সংখ্যাধিকে স্বার্থে বিপুল সংখ্যাধিকের আত্মসচেতন স্বাধীন আন্দোলন*[টীকাঃ মূল জার্মান-এ "আত্মসচেতন" শব্দটি নেই]*। আমাদের

বর্তমান সমাজের সবচেয়ে নিচের স্তর সর্বহারা শ্রেণীকে নড়তে বা উঠে দাঁড়াতে হলে তার ওপর চেপে বসে থাকা সরকারী সমাজের গোটা স্তরটিকে শুন্যে ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে উপায় নেই।

সারে না হলেও আকৃতির দিক থেকে বুর্শোয়ার বিরুদ্ধে সর্বহারার আন্দোলন প্রথমত এক জাতীয় আন্দোলন। প্রতিটি দেশের সর্বহারাকে প্রথমে তার নিজ দেশের বুর্শোয়ার সাথে ফয়সালা করতে হবে।

সর্বহারা শ্রেণীর বিকাশের একেবারে সাধারণ পর্বগুলি তুলে ধরার সময় আমরা দেখলাম বিদ্যমান সমাজে কমবেশী পর্দার আড়ালে এক গৃহযুদ্ধ চলছে, এক পর্যায়ে যে যুদ্ধ বিপ্লবের আকারে ফেঁটে পড়ে, যেখানে বুর্শোয়ার বলপূর্বক উচ্ছেদ সর্বহারার শাসনের ভিত্তি স্থাপন করে।

এযাবতকালের সমাজের প্রতিটি রূপ গড়ে উঠেছিল, যেমনটা আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণীর মধ্যে বৈরিতার ভিত্তিতে। কিন্তু একটি শ্রেণীকে নিপীড়ণ করতে হলে এমন পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে যাতে নিপীড়িত শ্রেণী তার দাসোচিত অস্তিত্ব অন্তত বজায় রাখতে পারে। ভূমিদাসত্বের কালে ভূমিদাস নিজেকে কমিউন *[(১৮৮৮ ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকাঃ কমিউন নামটা ফ্রান্সে উদীয়মান শহরগুলি দ্বারা গৃহীত হয় সামন্ত মনিব ও প্রভুদের কাছ থেকে "তৃতীয় মণ্ডলী" রূপে স্থানীয় স্বশাসন ও রাজনৈতিক অধিকার জয় করার এমনকি আগে। সাধারণভাবে বললে বুর্শোয়া অর্থনৈতিক বিকাশের একটি আদর্শ দেশ হিসেবে ইংল্যান্ডকে আর রাজনৈতিক বিকাশের আদর্শ হিসেবে ফ্রান্সকে নেয়া হয়েছে)। (১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকাঃ সামন্ত জমিদারদের কাছ থেকে প্রাথমিক আত্মশাসনের অধিকার ক্রয় অথবা জয় করার পর ইতালী ও ফ্রান্সের শহরের অধিবাসীরা তাঁদের শহর নগরের এই নাম দিয়েছিল)]* সদস্যের পর্যায়ে তুলেছিল ঠিক যেমন সামন্ত স্বৈরতন্ত্রের যাঁতাকলের অধীনে ক্ষুদে বুর্শোয়া বুর্শোয়ায় বিকশিত হতে সক্ষম হয়েছে। বিপরীতে আধুনিক শ্রমিক শিল্পের বিকাশের প্রক্রিয়ায় উপরে না উঠে নিজ শ্রেণীর অস্তিত্ব বজায় রাখার যা শর্ত, তারও নিচে গভীর থেকে গভীরতরভাবে পতিত হয়। সে নিঃস হয়ে যায়। আর নিঃসতা জনসংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধির চেয়ে দ্রুতগতিতে বাড়ে। সুতরাং এ থেকে এটা পরিষ্কারভাবে প্রতিপন্ন হয় যে বুর্শোয়ারা সমাজের শাসক হওয়ার যোগ্যতা আর রাখেনা আর নিজের অস্তিত্বের শর্তকে সমাজের উপর অপরিবর্তনীয় আইন হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার অধিকার তাদের নেই। সে শাসন করার অযোগ্য কারণ দাসত্বের মধ্যে সে দাসের অস্তিত্বের

নিশ্চয়তা দিতে অক্ষম। সে দাসদের এমন অবস্থায় ডুবে যেতে না দিয়ে পারেনা যেখানে তাদের দ্বারা ভরণপোষণের বদলে তাদেরকেই তার ভরণপোষণ করতে হবে। সমাজ এই বুর্শোয়ার অধীন আর বাঁচতে পারেনা, অন্য কথায়, তার অস্তিত্ব সমাজের সাথে আর খাপ খায়না।

বুর্শোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপতের শর্ত হচ্ছে পুঁজির সৃষ্টি ও বৃদ্ধি *[টীকাঃ মূল জার্মান সংস্করণে এই বাক্যটি এভাবে আছেঃ "বুর্শোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের শর্ত হচ্ছে স্বতন্ত্র ব্যক্তির হাতে সম্পদের সঞ্চয়, পুঁজির সৃষ্টি ও বৃদ্ধি..."]*; পুঁজির শর্ত হল মজুরি-শ্রম। মজুরি-শ্রম সম্পূর্ণভাবে শ্রমিকদের প্রতিযোগিতার ওপর নির্ভর করে। বুর্শোয়ারা যার অনিচ্ছুক প্রেরণাদাতা সেই শিল্পের বিকাশের ফলে, প্রতিযোগিতাহেতু শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আসে সংঘবদ্ধতাহেতু বিপ্লবী ঐক্য। সুতরাং, বুর্শোয়া শ্রেণী যার ওপর দাঁড়িয়ে উৎপাদন করে ও উৎপন্ন সামগ্রী আত্মসাৎ করে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটাই কেড়ে নিচ্ছে। তাই বুর্শোয়া শ্রেণী যা সৃষ্টি করছে তা হচ্ছে সর্বোপরি তার নিজের কবরখোদাইকারী। বুর্শোয়ার পতন আর সর্বহারার বিজয় সমান অনিবার্য।

২য় অধ্যায়

সর্বহারা ও সাম্যবাদীরা

সমগ্রভাবে সর্বহারাদের সাথে সাম্যবাদীদের সম্পর্ক কী?

শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য পার্টিগুলির প্রতিপক্ষ হিসেবে সাম্যবাদীরা পৃথক কোন পার্টি গঠন করেনা।

সমগ্রভাবে সর্বহারাদের থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোন স্বার্থ তাদের নেই।

সর্বহারা আন্দোলনকে রূপ দেওয়া ও পুনর্গঠনের জন্য তারা নিজস্ব কোন গোষ্ঠীগত *[টীকাঃ মূল জার্মান সংস্করণে "গোষ্ঠীগত" এর জায়গায় আছে "বিশেষ"]* নীতি খাড়া করে না।

সাম্যবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীর অন্য পার্টি থেকে কেবল এই দিক থেকে আলাদাঃ ১। বিভিন্ন দেশের সর্বহারাদের জাতীয় সংগ্রামে জাতি নির্বিশেষে তারা সমগ্র সর্বহারা শ্রেণীর সাধারণ স্বার্থকে সামনে তুলে ধরে ২। বুর্শোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে যে বহুবিধ স্তরের ভেতর দিয়ে যেতে হয়, সেখানে তারা সর্বদা ও সর্বত্র সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করে।

সাম্যবাদীরা তাই ব্যবহারিকভাবে প্রতিটি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির সর্বাধিক অগ্রসর ও দৃঢ় অংশ যারা অন্য সকলকে সামনে ঠেলে দেয়, অন্যদিকে তত্ত্বগতভাবে সর্বহারা শ্রেণীর অধিকাংশের তুলনায় তাদের এই সুবিধা আছে যে সর্বহারা আন্দোলনের সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত ও শেষ সাধারণ ফল সম্পর্কে তাদের পরিষ্কার উপলব্ধি রয়েছে।

সাম্যবাদীদের ও অন্য সকল সর্বহারা পার্টিগুলির আশু লক্ষ্য একইঃ সর্বহারাশ্রেণীকে একটি শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত করা, বুর্শোয়া আধিপত্য উচ্ছেদ করা, সর্বহারা শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করা।

সাম্যবাদীদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তগুলি কোনভাবেই এমন কোন ধারণা বা মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় যা বিশেষ কোন ভাবী বিশ্ব সংস্কারকের রচনা বা আবিষ্কার।

আমাদের চোখের সামনে যে ঐতিহাসিক আন্দোলন চলছে সেই বিদ্যমান শ্রেণীসংগ্রামের থেকে উত্থিত বাস্তব সম্পর্কগুলিকে সাধারণ সূত্র রূপে তারা প্রকাশ ধরেন। বিদ্যমান মালিকানা সম্পর্কের উচ্ছেদটা মোটেই সাম্যবাদের একান্ত কোন বৈশিষ্ট্য নয়।

ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সকল মালিকানা সম্পর্কেও ঐতিহাসিক বদল ঘটেছে।

ফরাসি বিপ্লব, উদাহারণস্বরূপ, বুর্শোয়া মালিকানার অনুকূলে সামন্ত মালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়েছে।

সাধারণভাবে মালিকানার অবসান নয় বরং বুর্শোয়া মালিকানার উচ্ছেদই হচ্ছে সাম্যবাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আধুনিক বুর্শোয়া ব্যক্তি মালিকানা হচ্ছে শ্রেণীবৈরিতার ভিত্তিতে মুষ্টিমেয় কর্তৃক অনেক লোকের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ও উৎপন্ন সামগ্রী আত্মসাতের চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার প্রকাশ *[টীকাঃ মূল জার্মান সংস্করণে "মুষ্টিমেয় কর্তৃক অনেক লোকের শোষণ" এর জায়গায় আছে "একের দ্বারা অপরের শোষণ"]*।

এই অর্থে সাম্যবাদীদের তত্ত্বকে একটি বাক্যে সারসংকলিত করা যায়ঃ ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ।

আমাদের বিরুদ্ধে—-সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে—-অভিযোগ এই যে আমরা ব্যক্তির নিজ পরিশ্রমের ফল হিসেবে নিজস্ব সম্পত্তি অর্জনের অধিকারকে উচ্ছেদ করতে চাই যা হচ্ছে তাদের ভাষায় ব্যক্তি স্বাধীনতা, সক্রিয়তা ও স্বাবলম্বনের মূল ভিত্তি।

কষ্টার্জিত, নিজ অর্জিত, উপার্জিত সম্পত্তি! আপনারা কি ক্ষুদে কারিগর ও ক্ষুদে কৃষকের সম্পত্তি মালিকানার কথা বলছেন যা বুর্শোয়া রূপের আগের সম্পত্তি মালিকানার রূপ? তাকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজন নেই, শিল্পের বিকাশ বেশ পরিমাণে তাকে ইতিমধ্যে ধ্বংস করেছে আর প্রতিটি দিন এখনো ধ্বংস করছে।

নাকি আপনারা আধুনিক বুর্শোয়া ব্যক্তিগত মালিকানার কথা বলছেন?

কিন্তু মজুরী-শ্রম কি শ্রমিকদের জন্য কোন সম্পত্তি মালিকানা সৃষ্টি করে? এক বিন্দুও নয়। এটা সৃষ্টি করে পুঁজি অর্থাৎ সেই ধরণের সম্পত্তি মালিকানা যা মজুরী-শ্রমকে শোষণ করে, যা তাজা শোষণের জন্য মজুরী-শ্রমের নিত্য নতুন সরবরাহ সৃষ্টির শর্ত ছাড়া বাড়তে পারেনা। পুঁজি ও মজুরী-শ্রমের মধ্যে বৈরিতার ভিত্তিতে সম্পত্তি মালিকানার বর্তমান ধরণ টিকে রয়েছে। বৈরিতার দুটি দিকই পরীক্ষা করে দেখা যাক।

পুঁজিপতি হওয়া মানে উৎপাদন-ব্যবস্থায় স্রেফ ব্যক্তিগত নয় বরং এক সামাজিক *প্রতিষ্ঠা* প্রয়োজন। পুঁজি এক যৌথ সৃষ্টি, আর সমাজের অনেক সদস্যের সম্মিলিত তৎপরতার মাধ্যমেই, আর শেষ পর্যন্ত সমাজের সকল সদস্যের সম্মিলিত তৎপরতাতেই তা সক্রিয় হতে পারে।

পুঁজি তাই কেবল ব্যক্তিগত নয় বরং এক সামাজিক শক্তি।

তাই, পুঁজিকে যখন সাধারণ সম্পত্তি তথা সমাজের সকল সদস্যের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, ব্যক্তি মালিকানা তা দ্বারা সামাজিক মালিকানায় রূপান্তরিত হয়না। মালিকানার সামাজিক রূপটাই কেবল পরিবর্তন হয়। সে তার শ্রেণী চরিত্র হারায়।

এখন মজুরী-শ্রম নিয়ে আলোচনা করা যাক।

মজুরী-শ্রমের গড় দাম হচ্ছে ন্যুনতম মজুরী অর্থাৎ শ্রমিককে স্রেফ এক শ্রমিক হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে যে পরিমাণ জীবিকার উপকরণ পরমভাবে দরকার। তাই শ্রমের মাধ্যমে একজন মজুরী শ্রমিক যা পায় তা দিয়ে শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও পুনরুৎপাদনই করা যায়। আমরা কোনভাবেই উৎপন্ন দ্রব্যের এই ব্যক্তিগত ভোগদখলকে বিলোপ করতে চাইনা, যে ভোগ তৈরি হয়েছে মানবজীবন বজায় রাখা ও পুনরুৎপাদনের জন্য, যা থেকে এমন কোন উদ্বৃত্ত হয়না যা অন্যের শ্রমের ওপর প্রভুত্ব করতে পারে। আমরা এই ভোগদখলের শোচনীয় চরিত্রটাকেই কেবল বিলুপ্ত করতে চাই যার অধীনে শ্রমিকেরা বেঁচে থাকে শুধু পুঁজির বৃদ্ধি করতে, আর ততক্ষণ পর্যন্ত বাঁচতে পারে যতক্ষণ শাসকশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন।

বুর্শোয়া সমাজে জীবন্ত শ্রম সঞ্চিত শ্রম বাড়ানোর উপায় মাত্র। সাম্যবাদী সমাজে সঞ্চিত শ্রম শ্রমিকের অস্তিত্ব প্রশস্ত, সমৃদ্ধ ও উন্নততর করার উপায় মাত্র।

তাই, বুর্শোয়া সমাজে বর্তমানের ওপর আধিপত্য করে অতীত। সাম্যবাদী সমাজে বর্তমান আধিপত্য করে অতীতের উপর। বুর্শোয়া সমাজে পুঁজি হচ্ছে স্বাধীন আর তার স্বতন্ত্র-সত্তা রয়েছে, যেখানে জীবন্ত ব্যক্তি হচ্ছে অধীন, স্বতন্ত্রসত্তাবিহীন।

আর এই অবস্থার বিলোপকে বুর্শোয়ারা বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার বিলোপ। আর সত্যিই তাই। বুর্শোয়া ব্যক্তিত্ব, বুর্শোয়া স্বাতন্ত্র্য ও বুর্শোয়া স্বাধীনতার বিলোপ সন্দেহাতীতভাবে আমাদের লক্ষ্য।

অবাধ বাণিজ্য, অবাধ বেঁচাকেনাই হচ্ছে উৎপাদনের বর্তমান বুর্শোয়া ব্যবস্থার অধীনে স্বাধীনতার অর্থ।

কিন্তু বেঁচাকেনাই যদি লোপ পায়, অবাধ বেঁচাকেনাও মিলিয়ে যাবে। অবাধ কেনাবেঁচা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের বুর্শোয়াদের অন্য সকল "আস্ফালনের" যদি কোন অর্থ থাকে তা মধ্যযুগের বাঁধাগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের বিধিনিষেধে আবদ্ধ কেনাবেঁচার সঙ্গে তুলনায়; উৎপাদনের বুর্শোয়া ব্যবস্থা ও কেনাবেঁচার আর খোদ বুর্শোয়াদের উচ্ছেদের সাম্যবাদী কর্মসূচির প্রেক্ষিতে এর কোন অর্থই টেকেনা।

আমরা ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ করতে চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত হয়ে উঠেন। অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনসংখ্যার দশভাগের নয় ভাগের ব্যক্তিগত মালিকানাতো ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। অল্প কিছু লোকের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকার একমাত্র কারণ হচ্ছে দশভাগের নয়ভাগ লোকের হাতে কিছুই না থাকা। তাই আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ আমরা এমন এক রূপের সম্পত্তি মালিকানা বিলোপ করতে চাই যার অস্তিত্বের আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে সমাজের ব্যাপক অধিকাংশ লোকের কোন সম্পত্তি মালিকানা না থাকা।

এককথায় আপনাদের অভিযোগ আমরা আপনাদের সম্পত্তির উচ্ছেদ চাই। একদম তাই, আমরা ঠিক এটাই চাই।

যে মুহূর্ত থেকে শ্রম আর পুঁজি, অর্থ, খাজনা, এমন একটা সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেনা যাকে একচেটিয়ায় রূপান্তরিত করা যায়, যখন স্বতন্ত্র ব্যক্তি মালিকানা বুর্শোয়া মালিকানা তথা পুঁজিতে রূপান্তরিত করা চলেনা তখনই আপনারা বলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য গেল *[টীকাঃ "পুঁজিতে" কথাটি মূল জার্মান সংস্করণে নেই]*।

তাহলে আপনাদের স্বীকার করতে হবে "স্বতন্ত্র ব্যক্তি" বলতে বুর্শোয়া ছাড়া, মধ্যশ্রেণীর সম্পত্তি মালিকদের ছাড়া আর কাউকে বোঝাননা। এহেন ব্যক্তিকে অবশ্যই পথ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে, তার অস্তিত্বকে করে তুলতে হবে অসম্ভব।

সমাজের উৎপন্ন দ্রব্য ভোগদখল থেকে সাম্যবাদ কোন মানুষকে বঞ্চিত করেনা, দখলির মাধ্যমে অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করার ক্ষমতা থেকে কেবল তাকে বঞ্চিত করে।

এই অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে যে ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপের সাথে সকল কাজ বন্ধ হয়ে যাবে আর সার্বজনীন আলস্য আমাদের পেয়ে বসবে।

তাহলে বিরাট আলস্যের জন্য তো বুর্শোয়া সমাজের বহু পূর্বেই গোল্লায় যাওয়ার কথা, কারণ এর সদস্য যারা কাজ করে তারা কিছুই পায়না আর যারা কিছু পায় তারা কোন কাজ করেনা। এই সমগ্র অভিযোগ এই কথারই পুনরুক্তির সামিলঃ যখন কোন পুঁজি থাকবেনা তখন মজুরী-শ্রমও থাকবেনা।

সাম্যবাদী উৎপাদন আর উৎপন্ন সামগ্রী দখলির পদ্ধতির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ দেয়া হয়েছে সেই একই অভিযোগ দেয়া হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক সৃষ্টির সাম্যবাদী উৎপাদন ও দখলির বিরুদ্ধে। বুর্শোয়ার কাছে যেমন শ্রেণী মালিকানার অবসান মানে উৎপাদনের অবসান, একইভাবে শ্রেণী সংস্কৃতির বিলোপ মানে তার কাছে সকল সংস্কৃতির বিলোপ।

সেই সংস্কৃতি যার বিলোপ নিয়ে সে কান্নাকাটি করে তা ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে যন্ত্রের মত খাটার একটা তালিম মাত্র।

বুর্শোয়া মালিকানা উচ্ছেদে আমাদের সংকল্পের বিচারে আপনারা যদি স্বাধীনতা, সংস্কৃতি, আইন ইত্যাদির বুর্শোয়া ধ্যানধারণার আশ্রয় নেন তাহলে আমাদের সাথে তর্ক করতে আসবেননা। আপনাদের বুর্শোয়া উৎপাদন ও বুর্শোয়া মালিকানার পরিস্থিতি থেকেই আপনাদের মতধারা সৃষ্ট হয়েছে, ঠিক যেমন আপনাদের আইনশাস্ত্র হচ্ছে আপনাদের শ্রেণীর ইচ্ছাআকাঙ্খা যাকে সকলের উপর আইন হিসেবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যে ইচ্ছা আকাঙ্খার চরিত্র ও লক্ষ্যও আবার নির্ধারিত হয় আপনাদের শ্রেণীর অস্তিত্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দ্বারা।

আপনাদের বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতি ও সম্পত্তির রূপ থেকে যে সামাজিক রূপ উত্থিত হয়—উৎপাদনের বিকাশের ধারায় যে ঐতিহাসিক সম্পর্কসমূহ উত্থিত হয় ও লোপ পায়—তাকে প্রকৃতির ও যুক্তির চিরন্তন নিয়ম হিসেবে রূপান্তরে উদ্বুদ্ধ করেছে যে স্বার্থপর ভ্রান্ত ধারণা তা আপনাদের আগেকার সব শাসকশ্রেণীরই ছিল। প্রাচীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে আপনারা যা দেখেন, সামন্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে আপনারা যা স্বীকার করেন, তাই আপনাদের নিজ বুর্শোয়া রূপের সম্পত্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাদের স্বীকার করা মানা।

পরিবারের উচ্ছেদ! সাম্যবাদীদের এই গর্হিত প্রস্তাব শুনে উগ্র চরমপন্থীরা পর্যন্ত ক্ষেপে ওঠে।

বর্তমান পরিবার, বুর্শোয়া পরিবার কীসের ভিত্তিতে গঠিত? পুঁজির ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত লাভের ভিত্তিতে। পূর্ণ বিকশিত রূপে এই পরিবার কেবল বুর্শোয়াদের মধ্যে অস্তিত্বমান। কিন্তু এরই

পরিপূরকভাবে সর্বহারাদের মধ্যে দেখা যায় পরিবারের কার্যত অনুপস্থিতি আর প্রকাশ্য পতিতাবৃত্তি।

বুর্শোয়া পরিবার তার পরিপূরকের মিলিয়ে যাওয়ার সাথে মিলিয়ে যাবে, আর পুঁজির অবলুপ্তির সাথে উভয়েই বিলুপ্ত হবে।

আপনারা কি আমাদের এই অভিযোগ দিতে চান যে আমরা পিতামাতা কর্তৃক সন্তানের ওপর শোষণ বন্ধ করে দিতে চাই? এই অপরাধ আমরা স্বীকার করছি।

কিন্তু আপনারা বলেন আমরা সবচেয়ে পবিত্র সম্পর্ক ধ্বংস করে দিচ্ছি যখন আমরা পারিবারিক শিক্ষার স্থানে বসাই সামাজিক শিক্ষাকে।

আর আপনাদের শিক্ষাটা! সেটাও কি সামাজিক নয়? আর সেই সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারা কি তা নির্ধারিত নয় যার অধীনে আপনারা শিক্ষা দেন বিদ্যালয় ও ইত্যকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামাজিক হস্তক্ষেপ মারফত? শিক্ষায় সামাজিক হস্তক্ষেপ সাম্যবাদীদের উদ্ভাবন নয়, তারা শুধু হস্তক্ষেপের চরিত্রটা পালটে দিতে চান এবং শিক্ষাকে শাসকশ্রেণীর প্রভাব থেকে উদ্ধার করতে চান।

আধুনিক শিল্পের ক্রিয়ায় সর্বহারাদের মধ্যে সকল পারিবারিক বন্ধন যত বেশি মাত্রায় ছিন্ন হতে থাকে আর তাদের সন্তানেরা হয়ে দাঁড়ায় কেনাবেচার সামগ্রী ও শ্রমের যন্ত্র, পরিবার ও শিক্ষা নিয়ে আর মাতাপিতার সাথে সন্তানের পবিত্র সম্পর্ক নিয়ে বুর্শোয়া নাকিকান্না ঘৃণ্য থেকে ঘৃণ্যতর হতে থাকে।

বুর্শোয়ারা সমস্বরে চিৎকার করে উঠেঃ কিন্তু আপনারা সাম্যবাদীরা যে নারীদের সাধারণ সম্পত্তি বানিয়ে ফেলতে চান।

বুর্শোয়া তার স্ত্রীকে স্রেফ উৎপাদনের এক যন্ত্র মনে করে। সে যখন শুনে যে উৎপাদনের যন্ত্রগুলিকে সমবেতভাবে ব্যবহার করা হবে, আর স্বাভাবিকভাবে এই উপসংহারে না এসে পারেনা যে নারীদের কপালেও তাই হবেঃ অন্য সবকিছুর মত সকলের ভোগ্য হতে হবে।

ঘুণাক্ষরেও তার মনে সন্দেহ জাগেনা যে আসল লক্ষ্য হচ্ছে নারীদের স্রেফ উৎপাদনের যন্ত্র দশা থেকে মুক্তিসাধন।

সাম্যবাদীরা নারীদের প্রকাশ্যে ও আনুষ্ঠানিকভাবে সাধারণ সম্পত্তি বানিয়ে ফেলবে, এই ভান করে বুর্শোয়ারা যে এত ধর্মক্রোধ দেখায় তার চেয়ে হাস্যকর আর কিছু হতে পারেনা।

নারীদের সাধারণ সম্পত্তি বানানো সাম্যবাদীদের কোন প্রয়োজন নেই; প্রায় স্মরণাতীতকাল থেকে এ প্রথার প্রচলন আছে।

সাধারণ পতিতাদের কথা না হয় ছেড়েই দেয়া হল, সর্বহারাদের স্ত্রী কন্যাদের হাতে কাছে পেয়েও আমাদের বুর্শোয়ারা সন্তুষ্ট নয়, একে অপরের স্ত্রীদের ফুসলিয়ে আনাতেই তাদের পরম আনন্দ।

বুর্শোয়া বিবাহ হচ্ছে আসলে সকলে মিলে সাধারণ স্ত্রী রাখার ব্যবস্থা, তাই সাম্যবাদীদের প্রতি বড়জোর এই অভিযোগ আনা যেতে পারে যে ভন্ডামীর আড়ালে ঢেঁকে রাখা হয়েছে নারীদের উপর যে সাধারণ মালিকানা, সেটাকে তারা প্রকাশ্যে আইনসম্মত রূপ দিতে চান। এটুকু ছাড়া এটা স্বতঃসিদ্ধ যে উৎপাদনের বর্তমান ব্যবস্থার বিলোপ তা থেকে উত্থিত নারীদের উপর সাধারণ মালিকানারও অবসান ঘটাবে, অর্থাৎ প্রকাশ্য ও গোপন দুই প্রকার পতিতাবৃত্তিই শেষ হয়ে যাবে।

সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ আনা হয় যে তারা স্বদেশ ও জাতিসত্তা বিলোপ করতে চান।

শ্রমজীবি মানুষের কোন দেশ নেই। তারা যা পায়নি তাকে আমরা কেড়ে নিতে পারিনা। যেহেতু সর্বহারা শ্রেণীকে সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, দেশের পরিচালক শ্রেণীর পদে উঠতে হবে *[টীকাঃ মূল জার্মান সংস্করণে "দেশের পরিচালক শ্রেণী"র জায়গায় আছে "জাতীয় শ্রেণী"]*, নিজেকেই জাতি হয়ে উঠতে হবে, তাই সেদিক থেকে সর্বহারা শ্রেণী নিজেই জাতি, যদিও তা বুর্শোয়া অর্থে নয়।

বুর্শোয়া শ্রেণীর বিকাশ, মুক্ত বাণিজ্য, বিশ্ববাজার, উৎপাদন পদ্ধতি আর তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন যাপনের মধ্যে একটা সার্বজনীন ভাব--এ সবের কারণেই জনগণের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য ও বৈরিতা দিনের পর দিন ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

সর্বহারা শ্রেণীর আধিপত্য এসবের আরো দ্রুত অবসান করবে। ঐক্যবদ্ধ তৎপরতা, অন্ততঃ অগ্রণী সভ্য দেশগুলির মিলিত প্রচেষ্টা সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির অন্যতম প্রথম পূর্বশর্ত।

যে অনুপাতে এক ব্যক্তি কর্তৃক আরেক ব্যক্তির শোষণ শেষ করা যাবে, সেই অনুপাতে এক জাতি কর্তৃক আরেক জাতির শোষণও বন্ধ হবে। জাতির মধ্যেকার শ্রেণীসমূহের মধ্যে বৈরিতা যে অনুপাতে শেষ হবে, সেই অনুপাতে এক জাতির প্রতি অন্য জাতির শত্রুতাও শেষ হবে।

ধর্মীয়, দার্শনিক ও সাধারণভাবে এক মতাদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্যবাদের প্রতি যে অভিযোগ দেয়া হয় তা গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্যতা রাখেনা।

মানুষের বস্তুগত অস্তিত্বের অবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজ জীবনের প্রতিটি বদলের সাথে সাথে তার ধারণা, মতামত, বিশ্বাস, এককথায় মানুষের চেতনা যে বদলে যায়, একথা বুঝতে কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাগে?

বস্তুগত উৎপাদনের যে অনুপাতে পরিবর্তন ঘটে, বুদ্ধিবৃত্তিক সৃষ্টির চরিত্রেরও সেই অনুপাতে পরিবর্তন ঘটে, চিন্তার ইতিহাস এছাড়া আর কী প্রমাণ করে? প্রতিটি যুগেই যে সব ধারণা আধিপত্য করেছে তারা চিরকালই ছিল তখনকার শাসকশ্রেণীরই ধারণা।

লোকে যখন এমন ধারণার কথা বলে যা সমাজে বিপ্লব আনছে, তখন তারা এই সত্যই প্রকাশ করে যে পুরোনো সমাজের মধ্যে নতুন সমাজের উপাদান সৃষ্টি হয়েছে, আর অস্তিত্বের পুরোনো অবস্থার বিলোপের সাথে তাল রেখে বিলুপ্ত হচ্ছে পুরোনো ধারণা।

প্রাচীন পৃথিবী যখন অন্তিম মুহূর্ত অতিক্রম করছিল, তখন খৃষ্ট ধর্ম প্রাচীন ধর্মকে জয় করে। যখন আঠার শতকের যুক্তিবাদী চিন্তার কাছে খৃষ্টীয় ভাবধারা পরাজিত হল, সামন্ত সমাজেরও মৃত্যু সংগ্রাম চলছিল সেদিনের বিপ্লবী বুর্শোয়ার সাথে। ধর্মমতের স্বাধীনতা ও বিবেকের মুক্তি শুধু জ্ঞানের রাজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার আধিপত্যটাকেই রূপ দিল *[টীকাঃ ১৮৪৮ সালের জার্মান সংস্করণে "জ্ঞানের" জায়গায় আছে "বিচারবুদ্ধি"। ১৮৭২, ১৮৮৩ ও ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে ইংরেজী সংস্করণের মত "জ্ঞানের" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে]*।

বলা হবে, "সন্দেহ নেই ধর্মীয়, নৈতিক, দার্শনিক ও আইনী ধারণাসমূহ ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এই পরিবর্তন সত্ত্বেও নিয়ত টিকে থেকেছে ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন, রাজনৈতিক বিজ্ঞান ও আইন।"

"তাছাড়া স্বাধীনতা, ন্যায় ইত্যকার চিরন্তন সত্য রয়েছে যা সমাজের সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান। কিন্তু সাম্যবাদ চিরন্তন সত্যকেই বিলোপ করে দেয়, ধর্ম ও সকল নৈতিকতাকে নতুন ভিত্তিতে পুনর্গঠিত না করে ধর্ম ও নৈতিকারই উচ্ছেদ করে; তাই তা ইতিহাসের সকল অতীত অভিজ্ঞতার পরিপন্থী।"

এই অভিযোগ কোথায় এসে দাঁড়ায়? সকল অতীত সমাজের ইতিহাস শ্রেণীবৈরিতার বিকাশের মধ্যে গড়ে উঠেছে; সে বৈরিতা একেক যুগে একেক রূপ নিয়েছে।

কিন্তু তারা যে রূপই নিকনা কেন, অতীত সকল যুগের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিলঃ সমাজের এক অংশ কর্তৃক অন্য অংশকে শোষণ। তাই এটা আশ্চর্য নয় যে অতীত যুগের সামাজিক চেতনায় যত ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যই প্রকাশ পাক না কেন, তা কয়েকটি সাধারণ রূপ বা সাধারণ ধারণার মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে, শ্রেণীবৈরিতার সম্পূর্ণ বিলোপ ছাড়া তা পুরোপুরি মিলিয়ে যেতে পারেনা।

সাম্যবাদী বিপ্লব হল চিরাচরিত সম্পত্তি সম্পর্কের সাথে মৌলিক বিচ্ছেদ; তাই এর বিকাশে যে চিরাচরিত ধারণার সাথেও মৌলিক বিচ্ছেদ নিহিত, তাতে আর আশ্চর্য কি।

কিন্তু সাম্যবাদের প্রতি বুর্শোয়া অভিযোগের প্রসঙ্গ যাক।

আমরা উপরে দেখলাম, বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম ধাপ হল গণতন্ত্রের যুদ্ধে জয়ী হতে সর্বহারা শ্রেণীকে শাসকশ্রেণীর পর্যায়ে উন্নীত করা।

বুর্শোয়াদের কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুঁজি কেড়ে নিয়ে উৎপাদনের সকল যন্ত্রকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসকশ্রেণী হিসেবে সংগঠিত সর্বহারার হাতে এবং সামগ্রিক উৎপাদিকা শক্তি যত দ্রুত সম্ভব বৃদ্ধি করতে সর্বহারাশ্রেণীকে তার রাজনৈতিক আধিপত্যকে ব্যবহার করতে হবে।

অবশ্যই শুরুতে এটা কার্যকর করা অসম্ভব হবে সম্পত্তির অধিকার ও বুর্শোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার উপর স্বৈরাচারী আক্রমণ না চালিয়ে; এমন ব্যবস্থা মারফত তা করতে হবে যা অর্থনীতির দিক থেকে অপর্যাপ্ত ও অযৌক্তিক মনে হবে, কিন্তু যাত্রাপথে এরা নিজে সীমা ছাড়িয়ে যাবে এবং পুরোনো সামাজ ব্যবস্থার ওপর আরো আক্রমণ প্রয়োজনীয় করে তুলবে *[টীকাঃ "পুরোনো সামাজ ব্যবস্থার ওপর আরো আক্রমণ প্রয়োজনীয় করে তুলবে" বাক্যটি মূল জার্মান সংস্করণে নেই]*; উৎপাদন পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপ্লবীকরণের উপায় হিসেবে যা অপরিহার্য।

এই ব্যবস্থাগুলি দেশে দেশে ভিন্ন হবে অবশ্যই।

তাসত্ত্বেও সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিতে নিম্নলিখিতগুলি মোটামুটি ভালভাবে প্রযোজ্য হবেঃ

১। ভূমির মালিকানা বিলোপ; জমির সমস্ত খাজনা জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয়।

২। উচ্চমাত্রার ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর।

৩। সকল উত্তরাধিকার বিলোপ।

৪। সমস্ত দেশত্যাগী ও বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি।

৫। রাষ্ট্রীয় পুঁজি ও নিরংকুশ একচেটিয়া সহ একটি জাতীয় ব্যাংক মারফত সকল ক্রেডিট রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

৬। সকল যোগাযোগ ও পরিবহণের উপায় রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

৭। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে কলকারখানা ও উৎপাদনের উপকরণের প্রসার; পতিত জমির আবাদ এবং এক সাধারণ পরিকল্পনাধীনে সমগ্র জমির উন্নতিসাধন।

৮। সকলের পক্ষে সমান শ্রমবাধ্যতা। শিল্পবাহিনী গঠন, বিশেষত কৃষির জন্য।

৯। কৃষির সাথে যন্ত্রশিল্পের সংযুক্তি; জনসংখ্যাকে সারাদেশে আরো বেশি সমভাবে বন্টন মারফত ক্রমান্বয়ে শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য দূর করা *[টীকাঃ "জনসংখ্যাকে সারাদেশে আরো বেশি সমভাবে বন্টন মারফত" কথাটি মূল জার্মান সংস্করণে নেই। ১৮৪৮ সালের জার্মান সংস্করণে "পার্থক্য" শব্দের জায়গায় আছে "বৈপরিত্য"। ১৮৭২, ১৮৮৩ ও ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে ইংরেজী অনুবাদের মতই "পার্থক্য" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে]*।

১০। সরকারী বিদ্যালয়ে সকল শিশুর বিনামূল্যে শিক্ষা। বর্তমানে যে ধরণের কারখানা শিশুশ্রম রয়েছে তার বিলোপ। শিল্পোৎপাদনের সাথে শিক্ষার সংযুক্তি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিকাশের ধারায় যখন শ্রেণী পার্থক্য দূর হবে, সমগ্র জাতির বিশাল এক সমিতির হাতে সকল উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হবে, সরকারী শক্তির রাজনৈতিক চরিত্র আর থাকবে না। সঠিক অর্থে, রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে অত্যাচার চালানোর এক সংগঠিত শক্তি মাত্র। বুর্শোয়া শ্রেণীর সাথে তার লড়াইয়ে অবস্থার চাপে যদি সর্বহারা শ্রেণী নিজেকে এক শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত করতে বাধ্য হয়, যদি বিপ্লবের মাধ্যমে সে নিজেকে শাসকশ্রেণীতে পরিণত করে ও শাসকশ্রেণী হিসেবে যদি সে উৎপাদনের পুরোনো ব্যবস্থাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে, তাহলে সেই পুরোনো অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবৈরিতা ও সাধারণভাবে শ্রেণীরও বিলোপ করবে, আর এর ফল হিসেবে শ্রেণী হিসেবে নিজ আধিপত্যেরও অবসান ঘটাবে।

শ্রেণী ও শ্রেণীবৈরিতা সম্বলিত পুরোনো বুর্শোয়া সমাজের স্থান নেবে এক সমিতি যাতে প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত।

৩য় অধ্যায়

সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সাহিত্য

১। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র

ক) সামন্ত সমাজতন্ত্র

নিজেদের ঐতিহাসিক অবস্থানের কারণে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের অভিজাতদের একটা কাজ হয়ে দাঁড়ায় আধুনিক বুর্শোয়া সমাজের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র লেখা। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসের ফরাসী বিপ্লব আর ইংরেজ সংস্কার আন্দোলনে *[টীকাঃ নির্বাচনী আইনের সংস্কার আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে যা ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্স ১৮৩১ সালে শ্রমিকশ্রেণীর চাপে অনুমোদন করে এবং ১৮৩২ সালে হাউজ অব লর্ড কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। এই সংস্কার ছিল ভূস্বামী ও লগ্নী অভিজাততন্ত্রের একচেটিয়া শাসনের বিরুদ্ধে, আর তা সংসদে শিল্প বুর্শোয়াদের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের দরজা খুলে দেয়। না সর্বহারা না ক্ষুদে বুর্শোয়া ভোটের অধিকার পায়, যদিও তাদের সেই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল]*। এই অভিজাতেরা ঘৃণ্য ভুইফোঁড়দের হাতে আবার পরাজিত হল। তারপর থেকে তাদের পক্ষে প্রচণ্ড রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানো সব মিলিয়ে প্রশ্নাতীত হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্যিক সংগ্রামই কেবল সম্ভব রইল। কিন্তু এমনকি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, পুনপ্রতিষ্ঠার পর্বের পুরোনো আওয়াজ তখন অচল হয়ে গেছে *[১৮৮৮ এর ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকাঃ ইংরেজ পুনরুত্থান (১৬৬০-১৬৮৯) নয়, বরং ফরাসী পুনরুত্থান (১৮১৪-১৮৩০)]*।

সহানুভূতির উদ্রেগ করতে অভিজাতবর্গ বাধ্য হল বাহ্যত নিজেদের স্বার্থ ভুলে কেবল শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থেই বুর্শোয়াদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ সূত্রায়িত করতে। এভাবে অভিজাততন্ত্র তাদের প্রতিশোধ নেয় তাদের নতুন প্রভুদের নামে টিটকারি দিয়ে আর তাদের কানে কানে বিড়বিড় করে আসন্ন প্রলয়ের ভয়ংকর ভবিষ্যতবাণী শুনিয়ে।

এভাবে উদ্ভব ঘটে সামন্ত সমাজতন্ত্রেরঃ আধা বিলাপ, আধা টিটকারি; আধা অতীতের প্রতিধ্বনি, আধা ভবিষ্যতের হুমকি; কখনো তাদের তিক্ত, ব্যাঙ্গাত্মক ও সুতীক্ষ্ণ সমালোচনা বুর্শোয়াদের হৃদয় চূর্ণ করে দেয়; কিন্তু আধুনিক সমাজের অগ্রগতি অনুধাবনে সামগ্রিক অক্ষমতা কার্যত তা হাস্যস্পদ করে তোলে।

অভিজাতবর্গ, জনগণকে তাদের পক্ষে সমাবেশিত করতে সর্বহারার ভিক্ষার থলি সামনে ব্যানার হিসেবে ঝোলায়। কিন্তু যারা মাঝেসাঝে তাদের দলে ভিড়ে তারা তাদের পিছন দিকটায় সামন্ত দরবারী চাপরাশ দেখে অশ্রদ্ধার অট্টহাসি হেসে ভেগে যায়।

ফরাসী বৈধতাবাধী ও "নবীন ইংল্যান্ড"দের একাংশ এই প্রহসনটা দেখায়। *[টীকাঃ বৈধতাবাদীরা ১৮৩০ সালে উচ্ছেদ হওয়া বুর্বন রাজবংশকে সমর্থন দেয় যা বংশানুক্রমিক বড় জমিদারদের স্বার্থের প্রতিনিধি ছিল। অভিজাত ধনী ও বড় বুর্শোয়াদের দ্বারা উত্থিত অরলিন্স রাজবংশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৈধতাবাদীদের একাংশ প্রায়শই সামাজিক গলাবাজি করে আর বুর্শোয়াদের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবি মানুষের রক্ষক হওয়ার ভাণ করে। নবীন ইংল্যান্ড ছিল রাজনীতিবীদ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক গ্রুপ যারা টোরি পার্টির সাথে যুক্ত ছিল। এটা ১৮৪০ এর দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়। নবীন ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিরা বুর্শোয়াদের বাড়ন্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে অভিজাত ভূস্বামীদের অসন্তোষের প্রতিফলন ঘটাত]*

বুর্শোয়াদের থেকে তাদের শোষণ পদ্ধতি আলাদা ছিল এটা দেখাতে গিয়ে সামন্তবাদীরা ভুলে যায় যে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিস্থিতি ও অবস্থায় শোষণ করত যা এখন অচল। তাদের শাসনে আধুনিক সর্বহারাশ্রেণীর কখনো অস্তিত্ব ছিলনা—এটা দেখিয়ে তারা ভুলে যায় যে বুর্শোয়ারা তাদের নিজ ধরণের সমাজেরই অনিবার্য সন্তান।

তাছাড়া অন্য সব ব্যাপারে নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল রূপটা এরা এত কম ঢাকে যে বুর্শোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এদের প্রধান অভিযোগ দাঁড়ায় এই যে, বুর্শোয়াদের শাসনাধীনে এক শ্রেণী গড়ে উঠছে যে অনিবার্যভাবে সমাজের পুরোনো ব্যবস্থাকে আগাগোড়া নির্মূল করে ফেলবে।

বুর্শোয়ার বিরুদ্ধে তাদের এত নিন্দার কারণ এই নয় যে সে সর্বহারা সৃষ্টি করছে বরং এই যে সে বিপ্লবী সর্বহারা সৃষ্টি করছে।

রাজনৈতিক অনুশীলনে তাই তারা শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সকল দমনমূলক পদক্ষেপে যোগ দেয়; আর ব্যক্তিজীবনে, তাদের সকল গালভরা বুলি সত্ত্বেও তারা ঝাঁপ দেয় শিল্পকারখানা থেকে পড়ন্ত সোনালী আপেল ধরার জন্য আর পশমী সুতা, বিট চিনি ও আলুর মদের

[১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকাঃ এটা প্রধানভাবে জার্মানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে অভিজাত জমিদার ও গ্রামীণ ছোট জমিদারেরা গোমস্তাদের মাধ্যমে অধিকাংশ জমি চাষ করাত, আর অধিকন্তু তারা ছিল বিট চিনি ও আলুর মদ উৎপাদক। আরো ধনী ব্রিটিশ অভিজাতেরা এখন পর্যন্ত বরং এর চেয়ে উপরে আছে, তারা জানে ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরেদের কমবেশী ক্ষয়িষ্ণু শেয়ারবাজারের কোম্পানীগুলিতে নিজেদের নাম ভাড়া দিয়ে কীভাবে পড়ন্ত সুদকে মোকাবেলা করা যায়] সাথে সত্য, প্রেম ও মর্যাদা বিনিময়ের জন্য *[টীকাঃ মূল জার্মান সংস্করণে "শিল্পকারখানা থেকে পড়ন্ত" কথাটা নেই]*।

জমিদারের সাথে পুরোহিত যেমন চিরকাল হাতে হাত ধরে চলেছে, তেমনি সামন্ত সমাজতন্ত্রের সাথে জুটেছে পাদ্রীদের সমাজতন্ত্র।

খৃষ্টীয় সাধুত্বকে সমাজতন্ত্রী রঙ দেয়ার চেয়ে সহজ কিছু আর নেই। খৃষ্টবাদ কি ব্যক্তিগত মালিকানা, বিবাহ ও রাষ্ট্রকে ধিক্কার দেয়নি? এর স্থলে কি তা দান ও দারিদ্র, কৌমার্যব্রত ও রিপু দমন, সন্যাস জীবন ও গির্জার কথা বলেনি? খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্র হচ্ছে সেই পবিত্র জল যা দিয়ে পাদ্রীরা অভিজাতদের হৃদয়জ্বালা মিটিয়ে থাকে *[টীকাঃ ১৮৪৮ সালের জার্মান সংস্করণে "খৃষ্টীয়" এর জায়গায় আছে "পবিত্র ও আজকের"। ১৮৭২, ১৮৮৩ ও ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে ইংরেজী অনুবাদের মত "খৃষ্টীয়" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে]*।

খ) ক্ষুদে বুর্শোয়া সমাজতন্ত্র

সামন্ত অভিজাতই একমাত্র শ্রেণী ছিলনা বুর্শোয়াদের দ্বারা যার সর্বনাশ হয়েছে, এটাই একমাত্র শ্রেণী নয় যার অস্তিত্বের শর্ত বাঁধাগ্রস্থ ও অবলুপ্ত হয়েছে আধুনিক বুর্শোয়া সমাজের পরিবেশে। মধ্যযুগীয় নাগরিক দল ও ক্ষুদ্র স্বত্বাধিকারী কৃষক ছিল আধুনিক বুর্শোয়াদের অগ্রদূত। শিল্প ও বানিজ্য উভয়ত অতি অল্প বিকশিত দেশগুলিতে এখনো এই দুই শ্রেণী উদীয়মান বুর্শোয়ার পাশাপাশি অস্তিত্বমান রয়েছে।

যেসব দেশে আধুনিক সভ্যতা পুরোপুরি বিকশিত হয়েছে, ক্ষুদে বুর্শোয়াদের এক নয়া শ্রেণী সেখানে জন্ম নিয়েছে, যে সর্বহারা ও বুর্শোয়ার মধ্যে দোল খায়, আর নিজেকে সর্বদা নবায়ন করছে বুর্শোয়া সমাজের এক উপজাত হিসেবে। এই শ্রেণীর ব্যক্তি সদস্যরা অবশ্য প্রতিযোগিতার চাপে অব্যাহতভাবে সর্বহারার স্তরে নেমে যায়, আর আধুনিক শিল্পের বিকাশের সাথে তারা এমনকি দেখতে পায় সেই মুহূর্ত আসছে যখন আধুনিক সমাজের একটা স্বাধীন শ্রেণী হিসেবে তারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে; শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে তার জায়গা নেবে যথাক্রমে পরিদর্শক, গোমস্তা ও দোকান কর্মচারী।

ফ্রান্সের মত দেশে যেখানে কৃষকেরা জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি, সেখানে বুর্শোয়ার বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষ নিয়েছিল যে লেখকেরা তারা বুর্শোয়া রাজত্বের সমালোচনায় ব্যবহার করবে কৃষক ও ক্ষুদে বুর্শোয়া মাপকাঠি, আর এইসব অন্তর্বর্তী শ্রেণীসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অস্ত্র হাতে তুলে নেবে, এটাই স্বাভাবিক। এভাবে ক্ষুদে বুর্শোয়া সমাজতন্ত্র জন্ম নেয়। সিসমন্দি ছিলেন এ ধারার প্রধান, শুধু ফ্রান্সেই নয়, ইংল্যান্ডেও।

সমাজতন্ত্রের এই মতধারাটি আধুনিক উৎপাদনের পরিস্থিতির মধ্যকার দ্বন্দ্বকে তীক্ষ্ণভাবে উন্মোচন করে দেখিয়েছে। অর্থনীতিবাদীদের ফেরি করা ভণ্ড কৈফিয়তের স্বরূপ ফাঁস করে দিয়েছে এরা। তারা তর্কাতীতভাবে তুলে ধরেছে যন্ত্রপাতি ও শ্রমবিভাগের মারাত্মক ফলাফল; মুষ্টিমেয়র মালিকানায় পুঁজি ও জমির কেন্দ্রীভবন, অতিউৎপাদন ও সংকট, ক্ষুদে বুর্শোয়া ও কৃষকদের অনিবার্য সর্বনাশ, সর্বহারাশ্রেণীর দুঃখদুর্দশা, উৎপাদনে নৈরাজ্য, সম্পদের বন্টনে তীব্র বৈষম্য, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক ধ্বংসাত্মক শিল্পযুদ্ধ, সাবেকী নৈতিক বন্ধন, পুরোনো পারিবারিক সম্পর্ক ও জাতিসত্তার ভাঙনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে তারা।

ইতিবাচক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে অবশ্য সমাজতন্ত্রের এই রূপটি হয় উৎপাদনের ও বিনিময়ের পুরোনো উপায়, আর সেই সাথে পুরোনো মালিকানা সম্পর্ক ও পুরোনো সমাজ ফিরিয়ে আনতে চায়, অথবা পুরোনো মালিকানা সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে উৎপাদন ও বিনিময়ের নতুন উপায়কে চেপে ঢুকাতে চায়, যা এই সব নতুন উপায়ের চাপে ফেটে চুরমার হয়ে গেছে, হওয়া অনিবার্য। উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রতিক্রিয়াশীল ও ইউটোপীয়।

এর শেষ কথা হলঃ শিল্পোৎপাদনের জন্য সংঘবদ্ধ গিল্ড প্রতিষ্ঠান; কৃষিতে পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক।

শেষ পর্যন্ত যখন ইতিহাসের কঠোর বাস্তবতা আত্মপ্রবঞ্চনার নেশা কেটে যায়, সমাজতন্ত্রের এই রূপ শোচনীয় নাকিকান্নায় পর্যবসিত হয় *[টীকাঃ জার্মান মূল সংস্করণে এই বাক্যটি এভাবে আছেঃ "বিকাশের ধারাবাহিকতায় এই ধারাটি শোচনীয় নাকিকান্নায় পর্যবসিত হয়]*।

গ) জার্মান অথবা "সত্যিকার" সমাজতন্ত্র

ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল ক্ষমতাসীন বুর্শোয়ার চাপের অধীনে এবং এই ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই অভিব্যক্তি হিসেবে। সে সাহিত্যের সাথে জার্মানী পরিচিত হল এমন একটা সময় যখন সেদেশের বুর্শোয়ারা সামন্ত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইটা সবে শুরু করেছে।

জার্মান দার্শনিকেরা, হবু দার্শনিকেরা আর সৌখিন ভাবুকেরা এই সাহিত্য লুফে নিল, তারা ভুলে গেল শুধু এই জিনিসটা যে ফ্রান্স থেকে যখন এই সাহিত্য জার্মানীতে আমদানি হয়েছে, ফরাসি সামাজিক পরিস্থিতি সেইসাথে আমদানী হয়নি। জার্মান সামাজিক পরিস্থিতির সংস্পর্শে এই ফরাসি সাহিত্য তার সকল প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক তাৎপর্য হারাল আর তার চেহারা হল নিছক সাহিত্যিক*[টীকাঃ মূল জার্মান সংস্করণে এর পর আরেকটি বাক্য ছিলঃ "বাস্তব সমাজ সম্পর্কে আর মনুষত্বের বাস্তবায়ন সম্পর্কে এটা নিছক কল্পনাবিলাসী ছাড়া আর কিছু হতে পারতনা"। ১৮৭২, ১৮৮৩ ও ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এই বাক্যটি ছিলঃ "মনুষত্বের প্রতিষ্ঠায় এটা নিছক কল্পনাবিলাসী ছাড়া আর কিছু হতে পারতনা"]*। তাই আঠার শতকের জার্মান দার্শনিকদের কাছে প্রথম ফরাসী বিপ্লবের দাবিগুলি ছিল স্রেফ সাধারণভাবে "ব্যবহারিক প্রজ্ঞার" দাবি মাত্র, আর বিপ্লবী ফরাসী বুর্শোয়া শ্রেণীর অভিপ্রায় ঘোষণার তাৎপর্য দাঁড়াল বিশুদ্ধ অভিপ্রায়, অনিবার্য অভিপ্রায়, সাধারণভাবে সত্যিকার মানবিক অভিপ্রায়ের আইন।

জার্মান পন্ডিতদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল নতুন ফরাসী ধারণাগুলিকে নিজেদের সনাতন দার্শনিক চেতনার সাথে খাপ খাওয়ান, নিজেদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ না করে ফরাসী ধারণাগুলিকে আত্মসাৎ করা।

যেমনভাবে একটা বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করা হয়, অর্থাৎ অনুবাদের মাধ্যমে এই আত্মসাতের কাজ চলেছিল।

সন্যাসীরা কীভাবে প্রাচীন পেগান চিরায়ত সাহিত্যের পুঁথিগুলির লেখার ওপর ক্যাথলিক সাধুদের নির্বোধ জীবনী লিখে রাখত সে কথা সুবিদিত। অপবিত্র ফরাসী সাহিতের ক্ষেত্রে জার্মান পণ্ডিতেরা এই প্রক্রিয়াকে উলটে দিল। ফরাসী মূলটার অভ্যন্তরে তারা তাদের দার্শনিক আবর্জনা লিখে রাখল। উদাহারণস্বরূপ তারা মদ্রার অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ফরাসী

সমালোচনার তলে লিখল "মানবতার বিচ্ছিন্নতা", এবং বুর্শোয়া রাষ্ট্রের ফরাসী সমালোচনার নীচে তারা লিখল "সাধারণ প্রত্যয়ের সিংহাসনচ্যুতি" আর এরকম আরো কিছু।

ফরাসী ঐতিহাসিক সমালোচনার পিঠে তারা তাদের দার্শনিক বুলিগুলি জুড়ে দিয়ে তার নাম দিল "কর্মের দর্শন", "খাঁটি সমাজতন্ত্র", "সমাজতন্ত্রের জার্মান বিজ্ঞান", সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি" ইত্যাদি।

ফরাসী সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সাহিত্য এভাবে পুরোপুরি নির্বীর্য করে তোলা হল। জার্মানদের হাতে যখন এ সাহিত্য এক শ্রেণীর সাথে অপর শ্রেণীর সংগ্রামের অভিব্যক্তি হয়ে আর রইল না, তখন তাদের ধারণা হল যে "ফরাসী একতরফাবাদ" অতিক্রম করা গেছে, সত্যিকার প্রয়োজন নয় বরং প্রকাশ করা গেছে সত্য-এর জন্য যা দরকার তা। সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ নয় বরং মানব প্রকৃতির স্বার্থ, সাধারণভাবে মানুষের স্বার্থ—যে মানুষের কোন শ্রেণী নেই, কোন বাস্তবতা নেই, যারা কেবল দার্শনিক কল্পনার ধোঁয়াশার মধ্যে বাস করে।

এই জার্মান সমাজতন্ত্র যে তার স্কুল পড়ুয়া বালকের কাজটা এমন গুরুগম্ভীর ভারিক্কী চালে গ্রহণ করে সামান্য পশরাটা নিয়েই ক্যানভাসারের মত গলাবাজি শুরু করেছিল, ইতিমধ্যে তার শিশুসুলভ সরলতা হারিয়েছে।

সামন্ত অভিজাততন্ত্র ও নিরংকুশ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জার্মানদের বিশেষত প্রুশিয়ান বুর্শোয়া শ্রেণীর লড়াইটা, অন্য কথায়, উদার আন্দোলন তখন অধিকতর উদ্যমী হয়ে উঠল।

এর মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলনের সামনে সমাজতন্ত্রের দাবিগুলি তুলে ধরবার দীর্ঘ আকাঙ্খিত সুযোগ এসে হাজির হল "খাঁটি" সমাজতন্ত্রের কাছে, হাজির হল উদার নীতি, প্রধিনিধিত্বমূলক সরকার, বুর্শোয়া প্রতিযোগিতা, সংবাদপত্রের বুর্শোয়া স্বাধীনতা, বুর্শোয়া আইন, বুর্শোয়া মুক্তি ও সাম্যের বিরুদ্ধে চিরাচরিত অভিশাপ বর্ষন করার সুযোগ, আর জনগণের প্রতি এই প্রচারের সুযোগ যে এই বুর্শোয়া আন্দোলনের দ্বারা তাদের কোন কিছু অর্জন করার নেই বরং সবকিছু হারাবারই সম্ভাবনা। ঠিক সময় জার্মান সমাজতন্ত্র ভুলে গেল, যে-ফরাসী সমালোচনার সে মূঢ় প্রতিধ্বনি মাত্র সেখানে আধুনিক বুর্শোয়া সমাজের অস্তিত্ব আগেই প্রতিষ্ঠিত, তার সাথে ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থা ও তদুপযোগী রাজনৈতিক সংবিধান, অথচ জার্মানীতে আসন্ন সংগ্রামের লক্ষ্যই ছিল ঠিক এইগুলিই।

জার্মান স্বৈর সরকার ও তার অনুসারী পুরোহিত, অধ্যাপক, গ্রাম্য মাতব্বর ও কর্মকর্তারদের কাছে আক্রমণোদ্যত বুর্শোয়া শ্রেণীকে ভয় দেখাবার চমৎকার জুজু হিসাবে তা কাজে লাগল।

ঠিক একই সময়ে এই সরকারগুলি জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহসমূহকে চাবুক ও গুলির যে তিক্ত ওষুধ গেলাচ্ছিল, এটা ছিল তার মধুর পূর্ণতা।

এই "খাঁটি" সমাজতন্ত্র এদিকে এইভাবে সরকারগুলির কাজে লাগছিল জার্মান বুর্শোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়ার এক হাতিয়ার হিসেবে, আর একইসাথে তা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ, জার্মান কূপমণ্ডূকদের স্বার্থের প্রতিনিধি। জার্মানীতে প্রচলিত অবস্থার সত্যিকার সামাজিক ভিত্তি ছিল *ক্ষুদে বুর্শোয়া শ্রেণী*, ষোল শতকের এই অবশিষ্টাংশটি তখন থেকেই নানা মূর্তিতে বারবার আবির্ভূত হয়েছে।

এই শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখা মানে জার্মানীর বিদ্যমান বর্তমান অবস্থাটাকেই জিইয়ে রাখা। বুর্শোয়াদের শিল্প ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বে এই শ্রেণীর নির্ঘাত ধ্বংসের আশংকা—একদিকে পুঁজির কেন্দ্রীভূতকরণের মাধ্যমে; অন্যদিকে সর্বহারা শ্রেণীর উত্থানের মাধ্যমে। "খাঁটি" সমাজতন্ত্র এই দুই পাখিকে এক ঢিলে মারতে চায়। মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ল তা।

জল্পনাকল্পনার মাকড়সার জালের পোশাক, তার উপর বাক্যালঙ্কারের নক্সী ফুল, অসুস্থ ভাবালুতার রসে সিক্ত এই স্বর্গীয় আচ্ছাদনে জার্মান সমাজতন্ত্রীরা তাদের অস্থিচর্মসার শোচনীয় 'চিরন্তন সত্য'কে সাজিয়ে পরিবেশন করল এই ধরণের লোকসমাজে তাদের মালের অসম্ভব কাটতি বাড়াতে।

আর নিজেদের দিক থেকে জার্মান সমাজতন্ত্রীরা নিজেদেরকে বেশিবেশি করে চিত্রিত করেছে ক্ষুদে বুর্শোয়া কূপমন্ডূকদের বাগাড়ম্বরী প্রতিনিধি হিসেবে।

তারা ঘোষণা করল জার্মান জাতি হল আদর্শ জাতি, কূপমণ্ডূক জার্মান মধ্যশ্রেণীই হল আদর্শ মানুষ। এই আদর্শ মানুষের প্রতিটি শয়তানী নীচুতার সে এক গোপন, উচ্চতর, সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেয়, তার আসল চরিত্রের একদম বিপরীত। সাম্যবাদ-এর "পাশবিক ধ্বংসাত্মক" প্রবণতার বিরুদ্ধে সে অনেক দূর এগিয়ে যায়, সকল শ্রেণীসংগ্রামের প্রতি তার সর্বোচ্চ ও পক্ষপাতহীন ঘৃণা ঘোষণা করে। আজকে(১৮৪৭)র জার্মানীতে যত তথাকথিত সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী প্রকাশনা প্রচলিত, দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাকি সবই এই কলুষিত ও ক্লান্তিকর সাহিত্যের মধ্যে পড়ে *[১৮৯০-এর জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকাঃ ১৮৪৮ সালের বিপ্লবী ঝড় সমগ্র ক্ষয়িষ্ণু ধারারকে ঝেটিয়ে বিদেয় করে আর এর কেন্দ্রীয় চরিত্রদের*

সমাজতন্ত্র নিয়ে হালকামি করার আকাঙ্খা দূর করে। এই ধারার প্রধান প্রতিনিধি ও ধ্রুপদী ধরণ হচ্ছে জনাব কার্ল গ্রুয়েন]।

২। রক্ষণশীল অথবা বুর্শোয়া সমাজতন্ত্র

বুর্শোয়া সমাজের অস্তিত্বকে ক্রমাগত বজায় রাখার জন্য বুর্শোয়াদের একটি অংশ সামাজিক অভাব অভিযোগের প্রতিকার চায়।

এই অংশের মধ্যে রয়েছে অর্থনীতিবীদ, লোকহিতৈষী, মানবতাবাদী, শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নয়নকারী, দাতব্য সংগঠক, প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধক সমাজের সদস্যগণ, মাদকবিরোধী গোঁড়া প্রচারকেরা, সম্ভাব্য সবরকম ধরনের খুচরো সংস্কারকরা। সমাজতন্ত্রের এই রূপটি পরিপূর্ণ মতধারা হিসাবেও গড়ে উঠেছে।

আমরা প্রুধোঁর *দারিদ্রের দর্শন* উদ্ধৃত করতে পারি এই রূপের একটা উদাহারণ হিসেবে।

সমাজতান্ত্রিক বুর্শোয়ারা আধুনিক সামাজিক পরিস্থিতির সুবিধাটা পুরোপুরি নিতে চায়, চায় না তৎপ্রসূত অবশ্যম্ভাবী সংগ্রাম ও বিপদটুকু। বিপ্লবী ও ধ্বংসকারী উপাদান বাদে তারা বিদ্যমান সামাজিক অবস্থাকে কামনা করে। তারা সর্বহারা ছাড়া বুর্শোয়া কামনা করে। বুর্শোয়া স্বাভাবিকভাবে দুনিয়াকে এমনভাবে দেখে যেখানে সেই শ্রেষ্ঠতম; আর বুর্শোয়া সমাজতন্ত্র এই আরামদায়ক ধারণাকে অনেকগুলো মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ বানায়। এই মতবাদকে কাজে পরিণত করে সর্বহারাশ্রেণী নতুন সামাজিক জেরুজালেমের দিকে এগিয়ে যাক, এই বলে আসলে এরা এটাই চায় যে সর্বহারাশ্রেণী এই বিদ্যমান সমাজের সীমার মধ্যে আটকে থাকুক আর বুর্শোয়া সম্পর্কে সকল ঘৃণাভরা চিন্তা ত্যাগ করুক।

এই সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় আর অধিক ব্যবহারিক কিন্তু কম সুসংবদ্ধ একট রূপ আছে; তাতে শ্রমিকশ্রেণীর চোখে বিপ্লবী আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় এটা দেখিয়ে যে স্রেফ রাজনৈতিক সংস্কার নয় বরং অস্তিত্বের বস্তুগত অবস্থার অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তনই কেবল তাদের জন্য লাভজনক হবে। অস্তিত্বের বস্তুগত অবস্থার পরিবর্তন বলতে এই ধরণের সমাজতন্ত্র অবশ্য কোনভাবে উৎপাদনের বুর্শোয়া সম্পর্কের উচ্ছেদ বোঝেনা, যে উচ্ছেদ কেবল বিপ্লবের মাধ্যমেই সাধন করা যায়, বরং বোঝে এই সম্পর্কগুলির অব্যাহত অস্তিত্বের ভিত্তিতে প্রশাসনিক সংস্কার। অর্থাৎ এহেন সংস্কার যা পুঁজি ও শ্রমের মধ্যকার সম্পর্কে

কোন দিক থেকেই আঘাত করেনা, বরং বেশী হলে বুর্শোয়া সরকারের খরচ কমায় ও প্রশাসনিক কাজ সহজতর করে।

বুর্শোয়া সমাজতন্ত্র কেবল তখনই পর্যাপ্ত মূর্ত রূপ লাভ করে যখন সেটা স্রেফ গলাবাজিতে পরিণত হয়।

মুক্তবাণিজ্যঃ শ্রমিকশ্রেণীর উপকারের জন্য, সংরক্ষণশুল্কঃ শ্রমিকশ্রেণীর উপকারের জন্য, জেল সংস্কারঃ শ্রমিকশ্রেণীর উপকারের জন্য। এটাই হচ্ছে বুর্শোয়া সমাজতন্ত্রের শেষ ও একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কথা।

এটা এই বুলিতে সারসংকলিত হয়ঃ বুর্শোয়ারা সর্বহারাশ্রেণীর উপকারের জন্যই।

৩। সমালোচনামূলক-কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ

আমরা এখানে সেসব সাহিত্যের কথা বলছিনা যা প্রতিটি মহান বিপ্লবে সর্বদাই সর্বহারাশ্রেণীর দাবীকে ভাষা দিয়েছে, যেমন বাবেফ ও অন্যদের লেখা।

নিজ লক্ষ্য অর্জনে প্রথম প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা সর্বহারাশ্রেণী চালিয়েছে সার্বজনীন উত্তেজনার সময় যখন সামন্ত সমাজ উচ্ছেদ হচ্ছিল, আর তা আবশ্যিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে সর্বহারাশ্রেণীর অবিকশিত অবস্থার কারণে, সেইসাথে তার মুক্তির অর্থনৈতিক শর্তের অনুপস্থিতির কারণে, যে পরিস্থিতি তখনো সৃষ্টি হয়নি আর কেবল বুর্শোয়া যুগেই তা সৃষ্টি হতে পারত। সর্বহারার প্রথম আন্দোলনগুলিতে তাদের সাথী হয়েছিল যে সাহিত্য তার প্রতিক্রিয়াশীল একটা চরিত্র থাকা ছিল অনিবার্য। সে সাহিত্য প্রচার করত সার্বজনীন কৃচ্ছসাধন ও স্থূল সামাজিক সমতাকে।

প্রকৃতপক্ষে যাকে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী মতাদর্শ বলা চলে, অর্থাৎ সাঁ-সিমোঁ, ফুরিয়ে, ওয়েন প্রমুখদের মতবাদ, জন্ম নেয় উপরে বর্ণিত সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্শোয়াশ্রেণীর মধ্যকার সংগ্রামের প্রাথমিক অপরিণত যুগে। (প্রথম অধ্যায় 'বুর্শোয়া ও সর্বহারা' দ্রষ্টব্য)

এই মতের প্রতিষ্ঠাতারা শ্রেণীবৈরিতা এবং প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিধ্বংসী উপাদানগুলোর ক্রিয়াটা দেখেছিলেন। কিন্তু তখনো নবজাতক সর্বহারাশ্রেণী তাদের কাছে এমন এক শ্রেণী হিসেবে দেখা দেয় যার কোন ঐতিহাসিক উদ্যোগ নেই, না আছে কোন স্বাধীন রাজনৈতিক আন্দোলন।

যেহেতু শ্রেণীবৈরিতা শিল্পের বিকাশের সাথে তাল রেখে বাড়ে, তাই তারা যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পেয়েছেন তা তাদের কাছে সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তির বস্তুগত শর্তগুলি তুলে ধরেনি। তাই তারা খুঁজতে লাগলেন সে শর্ত সৃষ্টি করার মত নতুন সামাজিক বিজ্ঞান, নতুন সামাজিক নিয়ম।

তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্ভাবন-ক্রিয়াকে আনতে হল ঐতিহাসিক ক্রিয়ার স্থানে; মুক্তির ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট শর্তের বদলে তাদের কল্পিত শর্ত, আর সর্বহারার ক্রমিক, স্বতস্ফূর্ত শ্রেণীসংগঠনের বদলে এই উদ্ভাবকদের নিজেদের বানানো সমাজ সংগঠন। তাঁদের চোখে ভবিষ্যত ইতিহাস তাদেরই সামাজিক পরিকল্পনার প্রচার ও ব্যবহারিক বাস্তবায়ন।

পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় তারা সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্থ শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় প্রধানভাবে যত্নবান হওয়ার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। সর্বহারাশ্রেণী তাদের কাছে সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্থ শ্রেণী হিসেবেই কেবল অস্তিত্বশীল ছিল।

শ্রেণীসংগ্রামের অপরিণত অবস্থা ও সেইসাথে নিজেদের চারপাশের পরিবেশের দরুন এই ধরণের সমাজতন্ত্রীরা মনে করতেন যে তাঁরা সকল শ্রেণীবৈরিতার অনেক ঊর্ধ্বে। তারা চেয়েছিলেন সমাজের সকল সদস্যের, এমনকি সর্বাধিক সুবিধাভোগীদেরও জীবন মান উন্নত করতে। তাই স্বভাবতই সমগ্রভাবে সমাজের প্রতি আবেদন করে শ্রেণী নির্বিশেষে, এমনকি শাসকশ্রেণীর প্রতি আবেদন-নিবেদন ছিল এঁদের পছন্দ। কেননা মানুষ যখন তাদের ব্যবস্থা একবার বুঝতে পারবে তখন কি তারা তার মধ্যে সম্ভাব্য উৎকৃষ্টতম সমাজের সম্ভাব্য সবচেয়ে ভাল পরিকল্পনা না দেখে পারবে?

তাই তারা সকল রাজনৈতিক ও বিশেষত সকল বিপ্লবী তৎপরতা বর্জন করলেন। তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে চান শান্তিপূর্ণ পথে যা অনিবার্যভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, অথবা উদাহারণ সৃষ্টির জোরে নতুন ধর্মবাণী রচনার জন্য এগিয়ে যেতে চান তারা।

ভবিষ্যত সমাজের এমন উদ্ভট চিত্র এমন সময় চিত্রিত হয়েছে যখন সর্বহারাশ্রেণী তখনো অতি অপরিণত অবস্থায় আর নিজের অবস্থান সম্পর্কে তাদের ধারণাও ছিল উদ্ভট; সমাজের সাধারণ পুনর্গঠণ সম্পর্কে এ শ্রেণীর প্রাথমিক স্বতস্ফূর্ত আকাঙ্খার সাথে এ ধরনের ছবির মিল দেখা যায় *[টীকাঃ ১৮৭২, ১৮৮৩ ও ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণে এই বাক্যটি এভাবে ছিলঃ "সমাজের সাধারণ পুনর্গঠণ সম্পর্কে এ শ্রেণীর প্রাথমিক স্বতস্ফূর্ত আকাঙ্খা থেকে এ ধরণের ছবি উদ্ভূত হয়েছিল"]*।

কিন্তু এই সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী প্রকাশনাগুলির সমালোচনামূলক উপাদানও আছে। তারা বর্তমান সমাজের প্রত্যেকটি নীতিকেই আক্রমণ করে। তাই তারা সর্বহারাশ্রেণীর আলোকপ্রাপ্তির সবচেয়ে মূল্যবান অনেক উপাদানে পরিপূর্ণ। সেসবে যেসব ব্যবহারিক প্রস্তাব করা হয়েছে *[টীকাঃ মূল জার্মান সংস্করণে এই বাক্যটি এভাবে ছিলঃ "ভবিষ্যত সমাজ সম্পর্কে তাদের যেসব ইতিবাচক প্রস্তাবনা ছিল"]* যেমন শহর ও গ্রামের পার্থক্য বিলোপ *[টীকাঃ মূল জার্মান সংস্করণে "পার্থক্য" এর স্থলে ছিল "বৈপরিত্য"]*, পরিবার প্রথার বিলোপ, ব্যক্তিগত লাভের জন্য শিল্প কারখানা পরিচালনার বিলোপ আর মজুরী প্রথার বিলোপ; সামাজিক ভারসাম্যের ঘোষণা আর উৎপাদনের অধিকতর তদারক হিসেবে রাষ্ট্রের কার্যকরিতা ঘোষণা—এসকল প্রস্তাবনাই সম্পূর্ণরূপে শ্রেণীবৈরিতা বিলোপ করতে চেয়েছে যে শ্রেণীবৈরিতা তখন কেবল জন্ম নিচ্ছিল, আর এসব এই প্রকাশনাগুলিতে আদি, অস্পষ্ট ও

অমূর্ত রূপে তা ধরা পড়েছিল। এই প্রস্তাবনাগুলি তাই ছিল খাঁটি কল্পনাশ্রয়ী (ইউটোপীয়) চরিত্রের।

সমালোচনামূলক ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ ঐতিহাসিক বিকাশের বিপরীত সম্পর্ক ধারণ করে। যে অনুপাতে আধুনিক শ্রেণীসংগ্রাম বিকাশ লাভ করে ও মূর্ত রূপ লাভ করতে থাকে, ঠিক ততই এই উদ্ভট সংগ্রাম পরিহারের, শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে এইসব উদ্ভট আক্রমণের সকল ব্যবহারিক মূল্য ও তাত্ত্বিক ন্যায্যতা হারায়। তাই, যদিও এই মতবাদের প্রবর্তকেরা বহু দিক থেকেই বিপ্লবী ছিল, তাদের শিষ্যরা প্রতিটি ক্ষেত্রে কেবল প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীতেই পরিণত হয়েছে। সর্বহারাশ্রেণীর প্রগতিশীল ঐতিহাসিক বিকাশের বিপরীতে তারা নিজ গুরুদের আদি মতগুলিকেই আঁকড়ে ধরে আছে। তারা তাই শ্রেণীসংগ্রামকে নিস্তেজ করে ফেলতে ও শ্রেণীবিরোধকে আপোষে মিটিয়ে ফেলতে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালায়। তারা তাদের সামাজিক ইউটোপিয়ার পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন "ফ্যালান্সটেরেস", "গৃহ উপনিবেশ" অথবা "ক্ষুদে আইকেরিয়া"*[(১৮৮৮-এর ইংরেজী সংস্করণে এঙ্গেলসের নোটঃ "ফ্যালান্সতেরেস ছিল শার্ল ফুরিয়ে কল্পিত সমাজতান্ত্রিক উপনিবেশ; আইকেরিয়া ছিল কাবে কর্তৃক তার ইউটোপিয়াকে ও পরে তার আমেরিকাস্থিত সাম্যবাদী উপনিবেশকে দেয়া নাম")। (১৮৯০ এর জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের নোটঃ '"স্বদেশী ক্ষেত্র' ছিল যাকে ওয়েন তার সাম্যবাদী আদর্শ সমাজের নাম দিয়েছেন। ফ্যালেন্সতারেস ছিল ফুরিয়ের কল্পিত গণ প্রাসাদের নাম। আইকেরিয়া ছিল কাবে কল্পিত ইউটোপীয় ভূমির দেয়া নাম যার সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠানগুলি তিনি কল্পনায় এঁকেছেন")]* প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এখনো দেখে—নয়া জেরুজালেম এর নব সংস্করণ হিসেবে—আর তাদের আকাশ কুসুম বাস্তবায়নের জন্য বুর্শোয়াদের আবেগ ও টাকার থলির কাছে আবেদন জানায়। উপরে যে প্রতিক্রিয়াশীল [অথবা] রক্ষণশীল সমাজতন্ত্রের চিত্র দেয়া হয়েছে, ধীরে ধীরে তারা সেখানে ডুবে যায়, তাদের পার্থক্য শুধু আরো প্রণালীবদ্ধ পান্ডিত্যে, আর তাদের সামাজিক বিজ্ঞানের অলৌকিক প্রভাবে তাদের অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসে।

তাই তারা শ্রমিকশ্রেণীর তরফ থেকে সকল রাজনৈতিক তৎপরতাকে ভয়ংকরভাবে বিরোধিতা করে, যে তৎপরতাকে নয়া সৃষ্ট ধর্মগ্রন্থে অন্ধ অবিশ্বাস থেকে এসেছে বলে তারা মনে করে।

ইংল্যান্ডে ওয়েনপন্থীরা আর ফ্রান্সে ফুরিয়েরপন্থীরা যথাক্রমে চার্টিস্ট ও সংস্কারবাদীদের বিরোধী *[টীকাঃ সংস্কারবাদীরা ছিল সংস্কার (লা রিফর্মে) পত্রিকার অনুসারী। এই পত্রিকাটি ১৮৪৩ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। তারা এক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আর গণতান্ত্রিক ও সামাজিক সংস্কার পরিচালনার কথা বলে]*।

চতুর্থ অধ্যায়

বর্তমান নানা সরকার-বিরোধী পার্টির সঙ্গে সাম্যবাদীদের সম্বন্ধ

২য় অংশ পরিষ্কার করেছে সাম্যবাদীদের সাথে বিদ্যমান শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য পার্টির সাথে যথা ইংল্যান্ডে চার্টিস্টদের আর আমেরিকায় কৃষি সংস্কারবাদীদের সাথে সম্পর্ক।

সাম্যবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীর আশু লক্ষ্য অর্জন আর তাৎক্ষণিক স্বার্থের বাস্তবায়নের জন্য লড়াই করে, কিন্তু বর্তমানের আন্দোলনের মধ্যে তারা ভবিষ্যতের স্বার্থের প্রতিনিধি ও রক্ষক। ফ্রান্সে সাম্যবাদীরা সমাজ গণতন্ত্রী *[টীকাঃ এই পার্টিকে পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করত লেদ্রু-রলিন, সাহিত্যে লুই ব্ল্যাংক, দৈনিক সংবাদ মাধ্যম সংস্কার (রিফর্ম)-এ। সমাজ গণতন্ত্রী নামটা জড়িয়ে আছে প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে, গণতন্ত্রী (ডেমোক্র্যাট) অথবা প্রজাতন্ত্রী (রিপাবলিকান) পার্টির এক অংশ সমাজতন্ত্রের রঙে রঞ্জিত ছিল (এঙ্গেলস, ইংরেজী সংস্করণ ১৮৮৮)]*-দের সাথে মিত্রতা করে রক্ষণশীল ও র‍্যাডিক্যাল বুর্শোয়াদের বিরুদ্ধে, কিন্তু মহান ফরাসী বিপ্লব থেকে ঐতিহ্য হিসেবে যেসব বাঁধা বুলি ও ভ্রান্তি চলে এসেছে তার সম্পর্কে সমালোচনার অধিকারটুকু বর্জন না করে।

সুইজারল্যান্ডে তারা র‍্যাডিক্যালদের সমর্থন দেয়, কিন্তু এই বিষয়টা ভোলা হয়না যে এই পার্টি পরস্পরবিরোধী উপাদান নিয়ে গঠিত, অংশত ফরাসী অর্থে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী, অংশত র‍্যাডিক্যাল বুর্শোয়া।

পোল্যান্ডে তারা সেই পার্টিকে সমর্থন করে যারা জাতীয় মুক্তির প্রধান শর্ত হিসেবে কৃষি বিপ্লবের ওপর জোর দেয়, সেই পার্টি যারা ১৮৪৬ সালের ক্র্যাকোভ বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলেছিল।

জার্মানিতে তারা বুর্শোয়ার সাথে মিলে লড়ে যখন তারা বিপ্লবী পথে লড়াই চালায় নিরংকুশ রাজতন্ত্র, সামন্ত জমিতারতন্ত্র ও ক্ষুদে বুর্শোয়াদের বিরুদ্ধে।

কিন্তু বুর্শোয়া ও সর্বহারার মধ্য যে বৈর বিরোধ বর্তমান তার যথাসম্ভব স্পষ্ট স্বীকৃতিটা সঞ্চার করার কাজ থেকে তারা এক মুহূর্তের জন্যও বিরত হয়না, যাতে বুর্শোয়া শ্রেণী নিজ আধিপত্যের সাথে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আসতে বাধ্য, জার্মান শ্রমিকেরা যেন তৎক্ষণাৎ তাকেই বুর্শোয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে; এইজন্যই যাতে জার্মানীতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির পতনের পর বুর্শোয়ার বিরুদ্ধেই অবিলম্বে লড়াই শুরু করা যায়।

সাম্যবাদীরা তাদের মনোযোগ প্রধানভাবে জার্মানীর দিকে দিচ্ছে কারণ সে দেশে একটি বুর্শোয়া বিপ্লব আসন্ন, ইউরোপীয় সভ্যতার অধিকতর অগ্রসর পরিস্থিতির মধ্যে তা ঘটতে বাধ্য, আর ঘটবে সতের শতকের ইংল্যান্ড ও আঠার শতকের ফ্রান্সের চেয়ে অনেক বিকশিত সর্বহারা শ্রেণী নিয়ে। এবং এই কারণে যে, জার্মানীতে বুর্শোয়া বিপ্লব হবে অব্যবহিত পরবর্তী সর্বহারা বিপ্লবের ভূমিকা মাত্র।

সংক্ষেপে, সাম্যবাদীরা সর্বত্রই বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে।

এসকল আন্দোলনের প্রত্যেকটিতে তারা সামনে আনে প্রধান প্রশ্ন হিসেবে মালিকানার প্রশ্ন, তার বিকাশের মাত্রা যাই হোক না কেন।

শেষ কথা, তারা সকল দেশের গণতান্ত্রিক পার্টিসমূহের ঐক্য ও সংহতির জন্য সর্বত্র কাজ করে।

আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে সাম্যবাদীরা ঘৃণা বোধ করে। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতির বলপূর্বক উচ্ছেদেই কেবল তাদের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। সাম্যবাদী বিপ্লবের আতঙ্কে শাসকশ্রেণীরা কাঁপুক। শৃংখল ছাড়া সর্বহারার হারানোর কিছু নেই। জয় করার জন্য আছে সারা দুনিয়া।

দুনিয়ার সর্বহারা এক হও! □